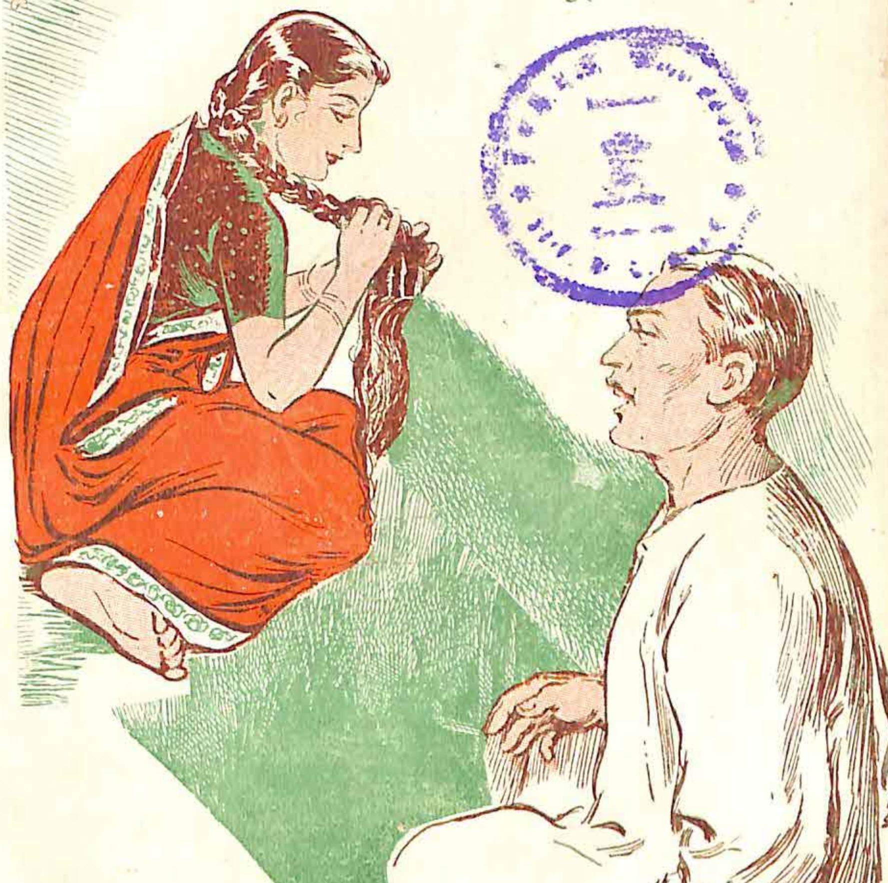
প্রমীলার সংসার

শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল



দেব · সাহিত্য · কুটীর
২২।৫ বি ঝামাপুকুর লেন : কলিকাতা

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত



১লা বৈশাখ, ১৩৬২

দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
এস, সি, মজুমদার কর্তৃক
মুদ্রিত

দুই টাকা



उपहार

প্রমীলার সংসার



নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন গৃহস্থের ঘর। যে ঘরের বাসিন্দারা নিজের-নিজের অধিকারটুকুর ভেতরেই পৃথিবীকে বন্দী করে রেখেছে ; দিবালোকে যারা নিজের দাসত্ব করে, আর রাত্রির অন্ধকারে ক্লান্ত চক্ষে যাদের শুধু নিদ্রা আসে। জীবন যাদের একেবারে সোজা, অভ্যস্ত এবং চির-পরিচিত !

ছোট রাস্তার ওপর ছোট একতলা বাড়ী। বাড়ীটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। অর্থাৎ যতই জীর্ণ ও পুরাতন হোক না

কেন,—বছরে বছরে রঙ্ চড়ে। সুমুখেই জীর্ণ একটি শিউলি গাছ। ওটার দিকে চাইলে সত্যিই হাসি পায়! সারা বছরের কয়েকটি দিন মাত্র গাছটির রসোৎসব। শরৎ কালের আগমনী এলে তবে দু-চারিটি শিউলি ফোটে। ফুল ফোটাবার জন্য সারা বছর গাছটির সে কি প্রাণান্ত প্রতীক্ষা আর দুরন্ত আশা! কিন্তু ঝরে পড়তেও দেরি হয় না—অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে অমন হাসি-মুখে বরণ করতে হয়তো একমাত্র শিউলিই পারে!

আবার ঋতুর পর ঋতু যায়; মুমূর্ষু গাছটি কাঙালের মত আকাশের পানে চেয়ে থাকে।

ছোট ঘরটির ছোট জীবন-যাত্রা। তবু মাথা তুললে আকাশ চোখে পড়ে; মহাকালের উত্তরীয়ের ছোঁয়া লাগে, অপরিচিত পথের চঞ্চল হাওয়ায় ঘরের প্রদীপ নিবে যায়।

সংসারে শিশু হয়ে সকলেই জন্মায় কিন্তু এমন অনেকেই আছে যারা চিরকাল শিশুই থেকে যায়। তারা বড় হয়, মানুষ হয়, ঘর করে কিন্তু পৃথিবীর হাটে তাদের কাণা-কড়িও মূল্য নেই। তারা না জানে নিজেকে, না

চেনে পরকে। সংসারে তারা দুঃখ নিশ্চয়ই পায়, কিন্তু দুঃখটা যে সত্যিই দুঃখ, এ জ্ঞানও তাদের নেই!

কথাটা বাসুদেবের সম্বন্ধে বেশ খাটে। জীবনে আর যাই থাকুক না কেন, মেরুদণ্ড বলে কোনো বস্তুর বালাই নেই! বেঁচে আছে এবং দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, এইটুকু হয়তো সে জানে। কিন্তু কি ভাবে বেঁচে আছে এবং কেমন করে দিন যাচ্ছে—এ-সব অনধিকার-চর্চ্চা কোনোদিন সে মনেও করে না।

স্ত্রীর নাম প্রমীলা। ভারি চঞ্চল মেয়ে। কাঠবিড়ালী যেমন সারাদিনের এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকতে পারে না—সেও তেমনি। দিনে-রাতে যতটুকু কাজ করে তার হিসেব নেই কিন্তু ছুটোছুটি করে তার গালে ঘামের ফোঁটাগুলি শুকোতে পায় না। সে কেবলই ছুট্‌ছে—এতটুকু তার বিরাম নেই!

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটিও ভারি মধুর!

প্রমীলা বলে—কি হচ্ছে কি তোমার সারা দিন? চারা গাছের সেবা ছাড়া কি তোমার আর কাজ নেই?

ছুটোছুটির ফাঁকে ফাঁকে এমনি করেই সে এক-একবার স্বামীর দিকে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়ায়।

বাসুদেব মুখ তুলে বলে—এই ছাখো, গাছে যদি না

একটু জল দিই—দেখ্‌ছ ত—গরম কাল, আকাশে কোথাও বৃষ্টির চিহ্ন নেই !

তা না থাক্—তুমি ভেতরে এসো। অত রোদ্দুরের তাতে বাইরে থাক্‌তে হবে না।

বাসুদেব তৎক্ষণাৎ উঠে আসে। প্রমীলা বলে—পাটির উপর বালিশ দিয়েছি, গরম কালের দিন একটু না ঘুমুলে শরীর খারাপ হয় !

সে যা বলে, বাসুদেব তাই করে। প্রমীলা তখন কাছে বসে বলে—কি নোংরা লোক, বাপু ! হাতে কাদা লেগে রয়েছে যে ?

বাসুদেব বলে—থাকলেই বা, কাদা ত !

প্রমীলা চোখ পাকিয়ে বলে—তা বলে তুমি কাদা মেখে থাকবে, আমি তাই দেখবো ?

উঠে গিয়ে ভিজে গামছা এনে সে বাসুদেবের হাত দুটি মুছিয়ে দেয়, পরে তখনি কাছে বসে বলে—ছেলেমান্‌ষী কর্‌তে হবে না, এসো। পুষি তোমার কোথায় গেল ?

বাসুদেব বলে—তাইত ভাবছি, রোদে রোদে কি জানি কোথায় এতক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে ! ভারি অবাধ্য হয়েছে ওটা। ভাবচি, ওর জন্যে—

প্রমীলা মুখ ভার ক'রে বলে—তুমি বুঝি এতক্ষণ তার কথা ভাবছিলে? আর আমি যে একটা মানুষ কাছে বসে রয়েছি, আমার কথাটা বুঝি তোমার—যাও, এখানে বসে থাকার চেয়ে আমার অন্য কাজ আছে।

এ ঘর ও ঘর ঘুরে ঘুরে সে আয়না চিরুণী মাথার তেল আরও কি-কি সব এনে মুখ ফিরিয়ে বসে। পরে নিজের মনেই বলে—দিন-রাত আমি বউ সেজে থাকতে পারি না বাপু!—বলেই মাথার কাপড়টা খুলে ঘন কালো চুলের রাশি এলিয়ে দেয়। চুলগুলো পিঠ কোমর ছাড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

বাসুদেব সেই দিকে চেয়ে তখনও বোধ করি পুষি বেড়ালের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে।

আয়নাটি সুমুখে রেখে প্রমীলা চুল আঁচড়ায়। এবং পাছে সেই আয়নার ভেতর দিয়ে স্বামীর মুখ হঠাৎ নজরে পড়ে, এজন্যে সে কোলের মধ্যে আয়নাটি টেনে নেয়। পরে মাথায় বিনুনি বাঁধে, সুগন্ধি তেল দিয়ে চুলগুলিকে চক্‌চকে করে তোলে। শেষকালে মাথার সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর পরে।

খানিকক্ষণ যায়। হঠাৎ পিছন ফিরে প্রমীলা হেসে

বলে—কি, দেখছো কি, শুনি? পুরুষ-মানুষের এ-সময়ে ঘরে থাকা ভারি অন্যায়। দেখছ, আমি চুল বাঁধছি!

বাসুদেব বলে—তাইত! দেখো লীলা, বড় চারাটায় বেলফুল কিন্তু এবার ধরবেই, তবে আর একটু যত্ন নিলে বোধ হয়—

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রমীলা তার দিকে একবার তাকায়। এ-বয়সে তার মন চায় স্বামীর একটু সোহাগ-আদর—নিজে থেকে বাসুদেব কখনও তার পানে একদণ্ড চেয়ে দেখল না—এমন জীবন্ত মন নিয়ে তার সামনে যৌবন-লাবণ্যবতী স্ত্রী—আশ্চর্য্য মানুষ! নিজেকে এমন ভাবে স্বামীর সামনে ধরে দিয়ে সেধে যেচে সোহাগ-আদরের প্রত্যাশা—তাও কোন দিন মিটল না! অকারণে নিজের প্রতি অতিরিক্ত একটা বিরক্তি আসে। রাগে তৎক্ষণাৎ সে বিনুনি খুলে ফেলে মাথাটা উস্কো-খুস্কো করে দেয়। বলে—থাক্—ভারি চুল, তার আবার কথা!

চোখ দুটি তার ছল্ছল্ করে আসে। উঠে বাইরে চলে যায়। গিয়েই দেখে, ঠাণ্ডা দালানের এক কোণে পুষি বেড়ালটা শুয়ে আছে। পা টিপে টিপে গিয়ে প্রমীলা তাকে চেপে ধরে। যত রাগ পড়ে তারই উপরে! তার

মুখের ওপর দু তিনটি চাপড় মেরে বলে—মুখপুড়ি, এতক্ষণ কোথায় ছিলি সর্ব্বনাশি ?

বিড়ালটা তার অন্নদাত্রীকে চেনে। সুতরাং মার খেয়েও কিছু বলে না, কেবল চোখ বুজে থাকে।

শুধু বিড়ালটাই মার খায়—কিন্তু চারাগাছটি অক্ষত অবস্থাতেই থাকে! সে যে ফুল দেয়!

স্বামীর ওপর ভক্তি এবং দয়া প্রমীলার অসীম! সে মনে করে, স্বামীটি তার নিতান্তই ছোট। সে যে কেন স্বামী হয়নি আর বাসুদেব যে কেন তার স্ত্রী হয়নি—এজন্যে মাঝে মাঝে সে অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করে। অর্থাৎ সব কথাতেই শাসন করে বলে—তুমি এর কি বোঝো ? তুমি কি জানো ? তুমি যেমন মানুষ তেমনি থাকো, তোমার কথা কয়ে দরকার নেই!

স্ত্রীর শ্রান্ত মুখখানির দিকে চেয়ে বাসুদেব ভাবে, কত কষ্টই ওকে সহ্য করতে হচ্ছে,—আহা!

কারো কষ্ট হচ্ছে, কেউ দুঃখ পাচ্ছে—এটা বাসুদেবের সহ্য হয় না। স্ত্রীকে পরিশ্রম করতে দেখে তার যতখানি লাগে, একটা মুটে-মজুরকে মোট বইতে দেখেও তার ততখানি আঘাত বাজে। এর জন্যে তার বাজে খরচেরও

অন্ত নেই। রাস্তায় কোথায় ভাঙ্গা কাঁচ পড়ে আছে, সে দেখতে পেয়ে কাঁচটি তুলে নর্দ্দামায় ফেলে দেয়। খোঁড়া কুকুর কোথায় পা ভেঙ্গে শুয়ে আছে—সে গিয়ে খাবার কিনে দিয়ে আসে। চড়ুই পাখীর জন্যে চাল-ডাল ছড়িয়ে দিয়ে দরজার কাছে চুপ করে বসে থাকে। প্রমীলা নিশ্বাস চেপে কত বার বলেছে,—ভাবি, তোমার বৌ না হয়ে যদি আমি চড়ুই পাখী হয়ে পা ভেঙ্গে পথে পড়ে থাকতুম—ভালো হতো!...

বাসুদেব এ কথার অর্থ বোঝে না। এ কথায় তার কেমন মজা লাগে! হেসে সে বলে—যা বলেছো লীলা! বলে সে ঠ্যাঙভাঙ্গা চড়ুইয়ের সেবায় মন দেয়—প্রমীলা নিশ্বাস ফেলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

সেটা বর্ষাকাল নয় তবু একটু আগে এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। শিউলির ডালে তখনও জলের ফোঁটা মুক্তোর মত দুলছে।

গাড়ী থেকে নেমে একটা ব্যাগ হাতে করে জহর এসে ঘরে ঢুকলো। বললে—কই গো, গেরস্থরা গেলে

কোথায় ?—নাঃ—ঘন ঘন যাতায়াত আর চলে না, দেখছি। লোকে সন্দেহও করে, খাতিরও কমে যায়।

প্রমীলা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঘরে ঢুকলো। মুহূর্ত্তে দুজনের মধ্যে একটা আনন্দের হৈ-চৈ পড়ে গেল।

ব্যাগটা নামিয়ে রেখে জহর হেসে বললে—যৌবনের নিকুঞ্জে তোমার দিন-রাতই পাখী ডাকে নাকি, হ্যাঁ প্রমীলা ? সেজেগুজে এলে সকল মেয়েকেই মানায়, কিন্তু তোমাকে যে এমন,—বাসুদার সন্নিসি রোগটা তাহলে কিছু কমেছে, বলো ?

প্রমীলা রুদ্ধ আনন্দিত কণ্ঠে বলতে লাগলো—উঃ, কত কাল বাদে তুমি এলে, বলো ত ? আমাদের না দেখে তুমি থাকতেও ত পারো বেশ !

জহর চিন্তিত মুখে বললে—ইস্! কিন্তু এটা ত ঠিক বন্ধুর স্ত্রীর মতন কথা হলো না প্রমীলা !

তা না হোক—তোমায় না দেখে যে আমরা থাকতে পারি না, এ কথা কি মুখেও বলতে পাব না ?

এমন সময় বাসুদেব এসে ঘরে ঢুকলো। লাফিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে জহর বললে—ভারি অসময়ে মুখ রক্ষে কর্‌লে বাসুদা ! প্রমীলা এমন সব কথা বলতে সুরু

করেছে যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে সে কথার জবাব দেয়া চলে না।

বাসুদেব বললে—কি রকম? তাহলে ত প্রমীলার আজ-কাল একটু জ্ঞান হয়েছে বলতে হবে! তুমি ওকে সেই এতটুকু দেখে গিয়েছিলে!

এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে জহর বললে—নাঃ, তোমার সন্নিসি হওয়াই উচিত ছিল বাসুদা! যা ভাবছো, তার ঠিক উল্টো। ভেবেছিলাম, প্রমীলার আর একটু জ্ঞান হলে আবার এ বাড়ীতে ঢুকবো, কিন্তু ও হরি, আজ এসে দেখি, আমার সম্বন্ধে আরও বেশী অজ্ঞান হয়ে গেছে!

প্রমীলা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

দুজনের মুখের দিকে একবার চেয়ে বাসুদেব বললে—তাই না কি? তাহলেই দেখো, কেউ ওর পর নয়। ওর কাছে আমিও যেমন, তুমিও তেমনি।

জহর ও প্রমীলা দুজনেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো। বাসুদেবকে জড়িয়ে ধরে জহর বললে—সন্নিসিদা, তোমাকে নিয়ে আমি বনবাসও কর্‌তে পারি!

প্রমীলা ভারি হিংসুটে মেয়ে। তৎক্ষণাৎ জহরের

একটা হাত ধরে টেনে বললে—ভাব-আলাপের অনেক সময় আছে, আগে এখন ঠাণ্ডা হও।

বাসুদেব বললে—পথে ভারি কষ্ট পেয়েছো, দেখতেই পাচ্ছি।

প্রমীলা জ্বলে উঠে বললে—তা আর কি হবে! আমার কাছে আসতে যদি কষ্ট পেয়ে থাকে ত সে কষ্ট জহরের গায়ে লাগবে না!

জহর মুখ টিপে বললে—উঃ, কি বিশ্বাস!

বাসুদেব বললে—তা প্রমীলা কিন্তু বাড়িয়ে বলে না, বুঝলে হে? আমি দেখেছি, তোমার চিঠির জন্যে কি রকম পথ চেয়ে থাকে! এই ত আজ সকালেও তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিল। তোমায় না দেখে মাঝে মাঝে ও থাকতেই পারে না। একটা মন যদি আর একটা মনকে চিনতে পারে ত তাদের বাঁধন কোন দিন ছেঁড়ে না।—প্রমীলার দিকে চেয়ে বললে, আমার অতিথিটিকে বেশ ভালো করে—

তীব্র কণ্ঠে প্রমীলা বলে উঠলো—তোমার অতিথি কি রকম? জহর তোমার কাছে এসেছে না কি? বলে জহরের একটা হাত জোর করে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সে ভেতরে চলে গেল।

ঝড়ো হাওয়া এসে যেমন সব ওলোট-পালোট করে দেয়, তেমনি বহুদিনের এই প্রার্থিত অতিথিটিকে পেয়ে প্রমীলার সব গোলমাল হয়ে গেল। মনে হলো, আকাশ তার আরো নীল হয়ে উঠেছে, দিনের আলো আরো উজ্জ্বল, ফুলের গন্ধ আরো মধুর! এক দিকে এতদিন জহরকে না দেখে সে ছিল কি করে এও যেমন সে ভাবতে লাগলো, তেমনি আবার সে চলে গেলেই বা প্রমীলা কি নিয়ে থাকবে—এ কথা ভেবেও তার চোখ দুটি ক্ষণে ক্ষণে ভারি হয়ে উঠতে লাগলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাসুদেব বললে—তোমরা কথাবার্ত্তা কও, আমি একবার দেখি—কই, পুষি গেল কোথায়? পুষি? পাখীটাকে আজ খাবার দেয়া হয়নি বুঝি? তাই অমন চেঁচাচ্ছে!

করুণ স্বরে জহর বলে উঠলো—আমাকে জলে ফেলে দিয়ে গেলে বাসুদা! বিয়ে-হওয়া মেয়েদের সঙ্গে কি ভাবে আলাপ করতে হয়—তাদের সঙ্গে কি কথা কইতে হয়, আমার তা আসে না।

বাসুদেব একবার ফিরে হেসে বললে—অবিবাহিত লোকের এ রকম মনে হওয়া আজ নতুন নয়।

রেগে উঠে জহর বললে—দেখ বাসুদা তুমি আমায় ছেলেমানুষ বললে সহ্য কর্ত্তে পারি কিন্তু বিয়ে হয়নি বলে খোঁটা দিলে রাগে আমার জ্ঞান থাকে না—তা বলছি। কি বলবো, তোমার ঘরে জলগ্রহণ করে ফেলেছি—নৈলে এই আমি চললাম।

উঠে দাঁড়াতেই প্রমীলা তার হাত চেপে ধরলো, বললে—ইস, যাও দেখি আমার হাত ছাড়িয়ে!

জহর হেসে বললে—তাইত! তোমার এই হাত ধরা দেখে অনেক দিনের একটা কথা মনে পড়ে গেল ভাই। কিন্তু—নাঃ, ভালোবাসা জিনিষটার সত্যিই কোনো মানে নেই, কি বলো প্রমীলা?

প্রমীলা বললে--ও-সব কথা নিয়ে আমার মাথা ঘামাতে ভালো লাগে না।

জহরও হাসতে হাসতে বললে—তুমি যে জীবনে কোনদিন কিছু নিয়ে মাথা ঘামিয়েছ, এ আমার জানা নেই!

জহরের হাতটা প্রমীলা তখনও ছাড়েনি। জহর বললে—তাইত তোমার পাল্লায় পড়ে দেখছি আমাকে শান্ত হতে হলো! বলবার কথা কি আছে তার ঠিক নেই

অথচ এমনি করে আমায় আগ্‌লে বসে থাকবে? ছাড়ো, ছাড়ো, বাসুদার সঙ্গে আমার ঢের কথা আছে।

প্রমীলা বললে—কক্ষনো আমি অত কথা ওঁর সঙ্গে তোমায় কইতে দেবো না! আমার সঙ্গে বুঝি কোন কথা থাকতে নেই?

তোমার সঙ্গে?—হেসে জহর বললে—মুখের কথা না বললে কি আর তোমার সঙ্গে কথা কওয়া হয় না প্রমীলা? তোমার আমার মধ্যে এমন কথাও আছে, আজ অবধি যার ভাষা তৈরি হয়নি। আশ্চর্য্য, এতটুকু তোমার বদল হয়নি!

প্রমীলা বললে—দিন-দিন মানুষের বদলানো অত সহজ কথা নয়! তোমারই বা কি বদল হয়েছে, শুনি? মেয়েদের নিয়ে দুষ্টুমি তোমার একটুও কমছে, বলতে পারো?

বেশ—আমার বদ্‌ অভ্যেসটার ওপর একটু রং বুলিয়ে ওটাকে দুষ্টুমি বলতে চাও!—এই জন্যে মাঝে মাঝে তোমাকে আমার এত ভালো লাগে ভাই। মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের যে একটা বন্ধুত্বের ব্যবহার দাঁড়াতে পারে, তুমি না থাকলে হয়ত এ-কথা কোনো দিন বুঝতেই পারতাম না। তোমার কাছে আমি সকল কথাই বলতে পারি প্রমীলা,

এই সহজ সম্বন্ধটা আছে বলেই আমাদের দুজনের মাঝখানে লজ্জার বালাই নেই এতটুকু! কিন্তু তা বলে আমরা নিজেদের না ভুল বুঝি!

প্রমীলা বললে—তুমি কথা বলছো, না, আমার দিকে চেয়ে আছো?

জহর বললে—তোমার মাথার দিকে না চেয়ে থাকতে পাচ্ছি না, এয়োতির চিহ্নটি আজ একেবারে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে যে!

মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে প্রমীলা বল্‌লে—আজ একটা ব্রত ছিল, তাই—

ব্রত? সাবিত্রীর ব্রত না কি? আমার একটা বউও নেই যে তোমার মত অমন টক্‌টকে সিঁদুর পরে!

হেসে প্রমীলা বললে—করলেই পারো! মেয়ে দেখার ঝঞ্ঝাট ত আর নেই, দু-একটা তোমার হাতে থাকেই, মন্তর পড়ে ঘরে আনলে সব দিকেই ভালো হয়!

জহর বললে—নাড়ি-নক্ষত্র সব চিনে ফেলেছ, দেখছি। বন্ধু, বিয়ে করলে তোমাদেরই দুর্দ্দিন। একটিকে চির-কালের মতন পেলে তখন কি আর তোমাদের মনে থাকবে? চাই কি মেয়েদের মন, তোমাদের হিংসেও হতে পারে!

হিংসে? মোটেই নয়। কিসের জন্যে হিংসে হবে, শুনি? সকলে মিলে থাকলে তখন কেমন হবে, বলো ত?

সতীনের মতন নাকি? বলেই তাড়াতাড়ি জহর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললে—বাসুদা, ও বাসুদা—যদি বেঁচে থাকো ত তোমার স্ত্রীর কথা শোনো। সতীন নিয়ে ঘর করতে ওর নাকি ভালো লাগে!

বাসুদেব তখন এক-মনে খাঁচার কাছে বসে চন্দনা পাখীটার জন্যে ভিজে ছোলা বেছে দিচ্ছিল। সে বললে— তা ও পারে। কোনো অবস্থায় নিজের আনন্দ হারায় না। আমার কাছে দেখছ ত, কত কষ্টে আছে, কিন্তু তা বললে কি হয়—

জহর অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রমীলা এসে বললে—বার-বার ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দেয়া কেন, শুনি?

বাসুদেব বললে—দেখছ ত হে, দেখো। মেয়েদের বোঝাই ভার। হাজার কষ্টে থাকলেও বলে, বেশ আছি। আবার সুখে থাকলেও চোখের জল ফেলে।—পাখীর দিকে চেয়ে বললে—চ্চু! চ্চু! ভারি ক্ষিদে পেয়েছে—না গঙ্গারাম?

বাসুদেবের ভাব দেখে জহর অবাক! দুদিনের জন্য এখানে এসেছে—বাসুদেবকে ভালোবাসে—তাকে জহরের ভালো লাগে—বাসুদেব একা থাকে—তার সঙ্গে হাসি-গল্প! কিন্তু—

জহর চারিদিকে তাকাতে লাগলো। প্রমীলা এখনো তেমনি আছে। কি সব কথা বলে! বোঝে না, এ সব কথা যদি অপরে শোনে? অথচ প্রমীলার মনে এতটুকু কলুষ নেই! তবু ভয় করে, মনের এই ভাব থেকে কখনো যদি—

নিজের মনে সে বলে ওঠে, না, না, সরল বাসুদেব!—জহর ভাবে, না, এখানে তার থাকা চলে না! কালই—

পরের দিন যাবার সময় প্রমীলা বললে—কিছুতেই আর একটি দিন তুমি রইলে না! এমন করে কেনই বা আসো, আর কেনই বা চলে যাও?

জহর বললে—থেকেই বা কি লাভ তোমাদের?

লাভের কথা কি বলছি?

আমি কিন্তু বলি। লাভ-লোকসানটা আমি ভারি বুঝি,

ভাই। এমন কি, সামান্ত পাওয়ার জন্যে বড় লোকসানও আমি মেনে নিতে পারি।

তা বলে আর একটা দিনও থাকতে পারতে না ?

না ভাই, একটি দিনও নয়। কাল সারা দিন তোমার রূপের প্রশংসা করেছি, এর পর তোমারই ভালো লাগবে না প্রমীলা। আমার এই ভালো লাগাটুকু ছাড়া তুমি আর কিছু চাও না, তা জানি। কিন্তু—

প্রমীলা বললে—চল, আমরা দুজনেই তোমার সঙ্গে যাই।

জহর হেসে বললে—মন্দ হয় না! সেই সঙ্গে ঐ পুষি বেড়ালটা আর ওই চন্দনাটাকেও নিয়ে গেলে বাসুদাকে বেশ অন্যমনস্ক রাখা চলবে, কি বল ?

যাও, কেবলই তোমার ঠাট্টা! কেউ কোথাও যাচ্ছে শুন্‌লে সত্যি আমি আর থাকতে পারি না।

বেশ ত, তুমি তাহলে একাই চল না!

বাসুদেব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল—সে বললে—সেই ভালো! জহরের বুদ্ধির কাছে আমরা কতটুকু ? সব দিক বুঝে কথা কয়।

কোন্দল কণ্ঠে প্রমীলা বলে উঠলো—আমাকে কেবলই

তোমরা জব্দ করবার ফন্দী করছো। আমি কি তাই বলছি? যাও—আমি কোথাও যেতে চাইনে।

ব্যস্ত হয়ে বাসুদেব বললে—যাওয়া ভালো। জহর যেখানে চাকরি করতে চললো, শুনেছি সেখানকার হাওয়া ভালো। তোমার শরীর যাতে ভালো হয়, সেই জন্যেই—

শরীর আমার ভালো হয়ে কাজ নেই। আমাকে তাড়াতে পারলেই সকলে বাঁচো!—বলে প্রমীলা দরজার আড়ালে চলে গেল।

বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাগটা হাতে নিয়ে জহর বললে—বিদায়ের পালাটা তাহলে আর জম্‌লো না! চোখের জল এক ফোঁটা ফেলে যাও বান্ধবী! নৈলে বিদেশে একা-একা থাকবো কি নিয়ে?

প্রমীলা তখনি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। বললে—গিয়ে চিঠি দেবে ত? ক'খানা করে মাসে লিখবে?

তোমাকে? অন্তত তিরিশখানা ত লিখবই। বাসুদা, আসি ভাই।

বাসুদা তার হাতটি একবার ধরে ফোঁশ করে একটি নিশ্বাস ফেলে বললে—কত কথা বলার ছিল রে, কিন্তু সব ভুলে গেলাম। আবার আসবি ত?

জহর হেসে ঘাড় নেড়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। প্রমীলা বললে—চিঠির জন্যে পথ চেয়ে থাকবো। মনে থাকে যেন!

মুখ বাড়িয়ে জহর হেসে বললে—তুমি একাই পথ চেয়ে থাকবে না, বন্ধু।

গাড়ী চলে গেল। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে প্রমীলা দূরে সেই চলন্ত গাড়ীখানার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

মনে হলো, সেও ছুটছে—গাড়ীখানার পিছু-পিছু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলেছে তবু যেন গাড়ীখানার নাগাল পাচ্ছে না!

রাতের বেলা দুজনে কথা হয়।

প্রমীলা বলে—কেন তুমি ও কথা বললে? কেন তুমি জহরের সঙ্গে আমায় যেতে বললে?

বাসুদেব বলে—তোমার যদি যেতে ইচ্ছে হয়, আমি কি ধরে রাখতে পারি?

আমার যেতে ইচ্ছে হয় কি না, তুমি জানলে কি করে?

তা কি করে জানবো? তুমি কি আমায় বলেছো কোনো দিন?

প্রমীলা বলে—ওকে আমার ভালো লাগে। কিন্তু—একটু থেমে সে বলে—কিন্তু এখান থেকে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, তা আমি আগেই বলে রাখছি।

স্বামীর পাশটিতে শুয়ে শুয়ে প্রমীলা অনেক কথা ভাবে। ভাবে, এই চারিদিকে দেয়াল-ঘেরা ছোট ঘরখানি, এই স্বামীটি, এই নরম বিছানা, ওই আলো, দেয়ালে ওই ছবিগুলি, ওই আলমারি, বাক্স, প্রসাধনের আসবাব—এগুলি নিতান্তই তার নিজের! বাইরের সমস্ত পৃথিবীর আড়ালে একান্তে এই ছোট অধিকারটুকুর কথা ভাবতে ভাবতে সে যেন দিশেহারা হয়ে যায়!

হঠাৎ এক সময়ে সে বলে—দেখছ, কড়িকাঠে কি রকম ঘুণ ধরেছে! কাল মিস্তিরি ডাকিয়ে ওগুলো পরিষ্কার ক'রে দিও।

বাসুদেব বললে—অত উঁচুতে নজর চলছে তোমার?

প্রমীলা প্রতিবাদ করে না। ভাবে, সত্যিই হয়ত ঘুণ ধরেছে। পরে অন্য দিকে চেয়ে বলে—ছবির কাঁচগুলো

কালকে ভালো করে মুছে দিতে হবে। ধুলো পড়ে কিছু দেখাই যাচ্ছে না।

বাসুদেব হেসে বললে—ধুলো বোধ হয় তোমায় চোখে পড়েছে!

প্রমীলা চুপ করে চারিদিকে তাকায়। পরে বলে—ঘুমোলে নাকি?—শুন্ছ?

কি?—বাসুদেব বললে।

আচ্ছা, জহর কি নিয়ে থাকে, বলতে পারো? ওর ত কিছুই নেই। পথে পথে চিরকাল ঘুরছে,—ওর কি এমনি ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে, বলতে চায়?

বাইরের অন্ধকারের দিকে নিদ্রাজড়িত চক্ষে চেয়ে বাসুদেব বললে—তাইত, ছোঁড়া এতক্ষণ কোথায় রয়েছে, কে জানে!

স্বামীর কথায় প্রমীলার চোখে জল এলো। সে বললে—আমি ঠিক বলতে পারি, জহরের এতটুকু সুখও নেই, শান্তিও নেই!

রাত্রির নির্জ্জনতায় দুজনের এই আরামের শয্যার আশে পাশে যেন কার অশরীরী তৃপ্তিহীন একটি মন নিশ্বাস

ফেলে ঘুরে বেড়ায়! সে যেন মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পেতে কাঙালের মত কি ভিক্ষা চায়!—জহরের সম্বন্ধে অন্ততঃ প্রমীলা এই কথাই ভাবে!

অনেকক্ষণ পরে চুপি চুপি এক সময় প্রমীলা বলে—তোমায় ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমি থাকতে পারবো না। —কিন্তু সত্যিই যদি যেতাম, তুমি কি থাকতে পারতে?

বাসুদেব তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। উত্তর না পেয়ে প্রমীলা হেসে বললে—এ কথাটা আমি যখনই জিজ্ঞেস করি, তখনই তোমার নাক ডাকে—কেমন?

সেও পাশ ফিরে চোখ বুজলো।

শহর না আরো কিছু। শহরের অনুকরণ! ওদিকে নদী, এদিকে ইষ্টিশান। কল-কারখানা তৈরী হচ্ছে—পাটের কল। বড় একটা ইস্কুল আছে। কলেজ খোলবার প্রস্তাব চলছে। ইলেকটিরিকের আলো এখনও হয়নি কিন্তু কল ঘুরোলে জল পড়ে। গেরস্থ-বাবুরা সকলেই কলকাতার ডেলি-প্যাসেঞ্জার। ফেরবার মুখে বিলিতি দুধের টিন আর দৈনিক বাঙ্লা খবরের কাগজ কিনে আনে—এক পয়সা দামের।

দু'তিনটে পাকা রাস্তা আছে বটে। ধুলো উড়িয়ে

মাঝে মাঝে হাওয়া-গাড়ীও ছোটে। একটা পথ গেছে উস্‌তির দিকে আর একটা হুগলীতে। ওটা গেছে সোজা গঙ্গার ধারে—যেখানে জমিদার বাবুদের বজ্‌রা দাঁড়ায়।

এই পথটার মুখেই বড় ডাকঘর। তিনটি কেরাণী, দুটি পিয়ন; আর বুড়ো পোষ্ট-মাষ্টার—কিছুদিন আগে বদলী হয়ে এসেছেন। নাকের ডগায় নিকেলের চশমা ঝুলিয়ে পেট বার করে কাজের তদারক করেন। পেট বলে' নুদিও নয়, ভুঁড়িও নয়—পেটে পীলে!

বুড়ো বলে—বিয়ে হ'লে পুত্র-কন্যে, আসে যেন প্রবল বন্যে! বে-থা' করো না বাপু—বুঝলে?

অবিবাহিত এখানে একমাত্র জহর। সে ঘাড় তুলে একটু হেসে বলে—বিয়ে দেবেই বা কে, বলুন?

দেবে কে? তা দেবার লোক অনেক আছে। কিন্তু তা বলে যেন যাকে-তাকে—

মাষ্টার বাবুটি সপরিবারে থাকেন। বাইরে ডাকঘর—ভেতরে সংসার। মাঝখানে দেশী ছিটের পরদা পেরিয়ে ছেলেমেয়েদের কলরব কাণে এসে লাগে।

বুড়ো বলে—চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছো বুঝি? হ্যাঁ—ওইটি ছোট ছেলে—বোকা। ভারি ইয়ে। বেটা ঘোড়াও নয়,

গাধাও নয়। ওষুধ খেয়েচিস, বোকা? কুইনিন-মিকচার? খায়ও কম নয়। ভাত খাওয়া দেখলে ভিরমি যেতে হয়। বয়েস হ'ল বৈ কি—তা বছর চারেক। বিয়ে হলে পুত্র-কন্যে আসে যেন—ওহে সুরেশচন্দর, টেলিগ্রামের রেকর্ড-গুলো রাখ্‌লে কোথায়?

সুরেশ ভারি স্পষ্ট বক্তা। বলে—সব তাতেই আপনার ভুল! এই মাত্র যে সেগুলো আপনার পার্সন্যাল্ বক্সে রেখে এলাম, মনে নেই?—আমরা যেন বয়স হবার আগেই দুনিয়া থেকে সরে যাই!

জগন্নাথ ভট্‌চায্যি খালি গায়ে আর খালি পায়েই আপিস করে। তার সঙ্গে সুরেশের বিশেষ বনিবনা বোধ হয় নেই। মনি-অর্ডারের রসিদ লিখ্‌তে লিখ্‌তে সে বলে—মরে গেলেই দুনিয়ার উপকার! যমরাজেরও ডিউটি খতম!

বুড়ো বলে—দুনিয়া যদ্দিন, বুড়োরাও তদ্দিন। বুড়োরা গেলে দুনিয়া চল্‌বে না! কি বল জহরলাল?

জহর মুখ তুলে তাকায়। বুড়ো তেমনি হেসে বলে—সুরেশ আমাদের ভারি হুঁশিয়ার। পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী উপযুক্ত আর হিসেবি। আমার দিকে চেয়ে কি ভাবে বলো ত জগন্নাথচন্দর?

জগন্নাথ তোতা পাখার মত বলে—ভাবে 'ভালো জায়গায় মন্দ লোক !'

জহর হাসে। সুরেশ কাণ দুটো লাল করে বলে—আমি কি আপনাকে হিংসে করছি? Do you mean to say it ?

জগন্নাথ সুবিধে নিয়ে বলে—রেগো না, সুরেশ রেগো না,—ভগবান তোমায় লাট-সাহেব না ক'রে কেরাণী করেছেন, তার জন্যে আমিও তাঁকে গালাগাল দিচ্ছি। কিন্তু রেগো না !

সুরেশ রাগে না, উত্তেজিত হয়ে বলে—কিন্তু chance-এর কথা বলা যায় না, মনে রেখো জগন্নাথ। আমেরিকায় ঝাড়ুদার মুচি যে প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসে, এটা গল্প-কথা নয়। একদিন চাই কি তোমারও বরাত—

জগন্নাথ বলে—রক্ষে করো ইয়ার, ভট্‌চায্যির ছেলে, দু'কলম পেটে পুরে ডাকঘরে ঢুকেছি। চাল-কলা বাঁধায় অরুচি ধরেছে! তা বলে ওই চান্সের কথাগুলো বলে আর ভাতে অরুচি ধরিও না! ওগুলো তোমারই থাকুক !

তোমাদের কাছে ও-সব বলা সময় নষ্ট করা বৈ নয় !

ঠিক কথা। কাজের সময়টা নষ্ট করে দিও না ভাই!

সুরেশ চুপ করে টেলিগ্রামের যন্ত্রটা ধরে বসে থাকে। সর্ব্বাঙ্গ তার রি-রি কর্‌তে থাকে।

বুড়ো চুপি চুপি জহরের কাছে বলে—সুরেশ যে কেন জমিদার হয়ে জন্মায়নি! এই জন্যে সকলেরই ওপর ওর রাগ! বাছারে!

আব্‌হাওয়াটা বিশ্রীই বটে! কিন্তু উপায় কি! এমনি করেই কিছুদিন কাটে।

বুড়ো বলে—বেশ, বেশ, তা এই দেশেই কায়েমি করে নাও। মা-বাপ ভাই-বোন কেউ নেই ত? বাঁচা গেছে। পিছটান থাকলে সুবিধে হয় না। খাশা থাকবে। ছেলেও তুমি ভালো। তেমনি শান্ত!

সুরেশ বলে ওঠে—ওপর দেখে মানুষকে বিচার করা চলে না কিছুতেই!

জগন্নাথ বলে—ওই দেখুন, আপনার সকল কথাকে ক্রশ্‌ করাই সুরেশের কাজ! তার চেয়ে নিজের চান্সের কথা ভাবো না সুরেশ!

এই অর্ব্বাচীনগুলির দিকে চেয়ে সুরেশের দয়া হয়। কিন্তু সে চুপ করেই থাকে।

বুড়ো হেসে বলে—আমি গেলে স্থরেশ পোষ্টমাষ্টার হবেই। এ-কথা আমি দিব্যি করে—

স্থরেশ পট্ করে বলে—অত ছোট কথা আমি ভাবিনে মাষ্টার মশাই! আপনাদের মতন ছোট-খাটো কথা ভাবা আমার অভ্যেস নেই!

স্থরেশ তা হলে বড় কথা ছাড়া কিছু ভাবে না! বিয়ে হলে পুত্র-কন্যে আসে যেন—বল্‌তে বল্‌তে বুড়ো পর্‌দা ঠেলে ভেতরে গিয়ে ঢোকে।

ইষ্টিশান থেকে পিয়ন ডাক আনে। শিলমোহর খুলে চিঠির তাড়া টেবিলের ওপর নামিয়ে দেয়। জহর তখন চিঠি 'সর্ট' কর্‌তে বসে। নানা রকমের চিঠি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেছে বেছে রাখতে বেশ লাগে।

এই কাজটার মধ্যে মস্ত এক আকর্ষণ আছে। যে কাজে বৈচিত্র্য নেই, নূতনত্ব নেই—সে কাজ জহরের ভালো লাগে না।

বুড়ো বলে—বেশ, মাথা তোমার জলের মত পরিষ্কার। হাঁ করলেই কথা ধরে নিতে পারো—কাজও তোমার তেমনি রগ্‌রগে। আর আমার ওই বড় ছেলেটা? বেটা

যেন খাজা! বললাম—সাতটা দু'আনি বেশী, না, বারোটা এক-আনি বেশী—বল ত চণ্ডী? বেটা মুখের ওপর জিজ্ঞেস কর্‌লে—রূপোর দু'আনি, না, নিকেলের দু'আনি, বাবা?

সুরেশ জগন্নাথ সকলেই হেসে ওঠে। অতি দুঃখে বুড়োও হাসে। হেসে বলে—বেটা অমনিই চিরকাল! বুঝলে জহর—ইস্কুলের এগ্‌জামিন হয়ে গেলে বললাম—কত নম্বর পেলি চণ্ডী? বল্‌লে—নম্বর যা পেয়েছিলাম, তার থেকে সব কেটে নিলে বাবা!

সুরেশ বলে—তবে আর কি! ওকেও এবার ডাক-ঘরের চাকরিতে ঢুকিয়ে নিন্। চাই কি ওই বিদ্যে নিয়েই একদিন পোষ্টমাষ্টার হয়ে যেতে পারে!

কথায়, কণ্ঠস্বরে এবং বলবার ভঙ্গীতে এমন একটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তার প্রকাশ হয়ে পড়ে যে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বুড়ো ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে জহরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

কোনো দিক দিয়ে এই এত বড় সত্য কথাটার সমর্থন না পেয়ে সুরেশ তখন বিজ্ঞের মত হাসতে থাকে।

জহর এক পাশে বসে নিজের মনে চিঠি সর্ট কর্‌তে

থাকে। যে মহল্লার যে চিঠি—সেই মহল্লার খুপ্‌রিতে বেছে বেছে রাখে। কত চিঠি কত দেশ থেকে আসে, কত কথা বয়ে আনে! কতকগুলি কালির অক্ষরে একটা মানুষ নিজেকে কেমন বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করেছে, তারই ছোট ছোট ছবিগুলি মোড়কের মধ্যে চলে আসে। সংসারে এই সহস্র কোটি মিথ্যার মধ্যে মানুষ শুধু পত্রের মধ্যেই অতি গোপনে সত্য কথাটি বলে ফেলে। যে লিখছে, আর যাকে লেখা হচ্ছে—তারা দুজন ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই! একজনের অন্তর সেখানে আর একজনের অন্তরকে স্পর্শ করে! চিঠির সত্য পরিচয় সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়!

চিঠি বাছতে বাছতে অনেক নাম এবং অনেক ঠিকানা মুখস্থ হয়ে গেছে।

হঠাৎ সেদিন একখানি চিঠি বিশেষ করে জহরের চোখে পড়ে গেল। আসমানী রঙের একখানি খাম। এখানকার জমিদার-বাড়ীর ঠিকানা। ওপরে নাম লেখা—শ্রীমতী রাগিণী দেবী। পত্রখানি ওজনে একটু ভারি।

কিন্তু নামটি বেশ! নামের পাশ দিয়ে যেন একটি স্বপ্নের ছায়া উঁকি মারে!

বুড়ো তখন বলছে—ওহে ছোকরা, আজকে যে শনিবার, এটা মনে আছে ত ? যাও, সকাল সকাল ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়গে। আমিও—

ওরা তখন সকলেই চলে গেছে। জহর বললে—আপনি যান না, আমি বেশ বসে আছি। তাছাড়া এগুলো করে রাখলে আমাদেরই ত সুবিধে।

পিয়নের কাজগুলো তোমার করবার দরকার কি ?

জহর হেসে বল্‌লে—কাজের কি বিষয় ভাগ করা চলে ? সকল কাজই সকলে করতে পারে।

এ হে হে, এ ছেলেটা দেখছি—ফিরে দাঁড়িয়ে বুড়ো আবার বল্‌লে—তোমাকে আমি মানুষ করে দেবো জহর ! কোনো ভাবনা নেই তোমার। তোমার মত ছেলে আমি একটিও পাইনি। যা কিছু আমি জানি, সব তোমায় শিখিয়ে যাবো। কিন্তু মন দিয়ে এ কাজে লেগে থাকা চাই। পয়সা-কড়ি তেমন কিছু নেই বটে, কিন্তু চাকরি বড় ভালো। কাজ করে সুখ আছে। ক্রমে বুঝবে !

জহর বললে—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বুড়ো ভেতরে যাবার সময় বললে—চিঠি বাছা যখন হয়ে যাবে—বুঝলে—তখন কি করবে, বল দেখি ?

জহর হেসে বললে—ঘরে তালা বন্ধ করে চাবিটা পরদার তলা দিয়ে—

ইয়া! ঠিক ধরেছ। তুমি দেখছি, নিতান্তই ঘরের লোক হয়ে উঠলে! বিয়ে হলে পুত্র-কন্যে আসে যেন—বলতে বলতে বুড়ো হুঁকো হাতে করে ভেতরে গেল।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জহর বললে—এসো, এসো। পরদার ফাঁক দিয়ে অন্দরের দিকে আকুল হয়ে চেয়ে আছি! নিতান্তই ঘরের লোক হয়ে উঠেছি, কি বল বিজয়া?

বিজয়া এদিক-ওদিক চেয়ে চুপি চুপি বললে—চুপ করুন। বাবা বোধ হয় এখনও ঘুমোননি।

ঘুমোননি? বাপগুলো ঘুমিয়ে পড়লেই কিন্তু আমাদের সুবিধে! মা কি ঘুমিয়েছেন? না, এখনও জেগে আছেন?

বিজয়া বললে—তাঁর জ্বর এসেছে। এই মাত্র ওষুধ খাইয়ে আসছি।

যাক্—মাঝামাঝি অবস্থা! এ বরং মন্দ নয়। তারপর? সাতদিন অন্তর এই শনিবারটির আশায় তুমিও যে আমার মত

পথ চেয়ে বসে থাকো, তা তোমার মুখ-চোখ দেখে বুঝতে পাচ্ছি।

হেসে বিজয়া বললে—এতক্ষণে বুঝি আপনার মুখে কথা ফুট্‌লো!

জহর বললে—ঠিক বলেছ বিজয়া! তোমাদের না দেখলে আমার মুখে সত্যিই কথা ফোটে না! পুরুষ-মানুষগুলোর কাছে আমি একেবারে কুঁকড়ে থাকি! কিন্তু যাই বল বিজয়া, এমন চাকরি আর হবে না! সদরে চাকরি আর অন্দরে—

বিজয়া তাড়াতাড়ি বললে—আস্তে আস্তে কথা বলুন। আপনার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই?

গলা নামিয়ে জহর বললে—তোমাদের দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে যাই বিজয়া ঃ যতগুলি দেখলাম, সবগুলিই শ্রীরাধিকা! শ্যাম-কুল আর আয়ান-কুল দুটোই রাখতে চাও!

লজ্জায় বিজয়ার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বললে—নাই বা কথা কইলেন আমার সঙ্গে! যদি এতই আপনার ইয়ে হয়ে থাকে, তাহলে—

বেশ! এও এক রকম মেয়েলি কায়দা!—আচ্ছা, এত ব্যস্ত কেন বলতে পারো?

জানিনি।—বিজয়া বললে।

জহর বললে—ভারি দয়ালু লোক কিন্তু। চাবিটি পর্য্যন্ত আমার হাতে দিয়ে চলে যান্—এমন বিশ্বাস!—তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার হেসে বললে—ঘরের লোক যে হয়ে উঠেছি, তাতে আর সন্দেহ নেই!

বিজয়া চোখ পাকিয়ে বললে—বারবার ওকথা না বললে চলে না? গোড়া থেকে আপনার সঙ্গে আমার কথা না কওয়াই উচিত ছিল!

উচিতটা ত তুমিই ভাঙলে! আমি চাকরি করতে এলাম, ওই পরদাটাও তোমায় পেয়ে বসলো! আড়াল থেকে মুখ টিপে আপন-মনে হাসি, আঁচলের চাবির শব্দ করা, ছোট ভায়ের কাণে চুপি-চুপি কথা বলা,—তারপর আরও কত কি! পুরুষের মন! একদিন আলাপ করে ফেললাম। ভারি চমৎকার কায়দায় আমাদের আলাপ হয়েছিল, না বিজয়া?

বিজয়া বললে—আর আপনার বুঝি কোনো অপরাধ নেই?

নেই? ও হরি আমার সমস্ত জীবনই যে অপরাধের বোঝা! তা আর কি করি, বল? নিজের ওপর আমি

কোনদিন মাষ্টারি করিনে !—যাই হোক্, তোমার রোগের ওই উপসর্গগুলো দেখে আমাকেও রুগী হতে হল ! ভাগ্যে আমাদের সুরেশবাবু লক্ষ্য করেনি, তাই রক্ষে !

তাহলে কি হতো ?

কিছুই না। কেবল শ্বশুর-মশায়ের তাড়নায় জামাতা দেশছাড়া হতেন !—কে আসছে, না ?

বলতে না বলতেই বিজয়া হঠাৎ একদিকে চেয়ে তীর-বেগে ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু কেউ নয়। কারো আসবার কথা নয়। এর আগেই যে ডাকঘর বন্ধ হয়ে যায়, এ কথা সবাই জানে ! ওটা শুধু হাওয়ার শব্দ।

বিজয়া আবার এসে পরদার কাছে দাঁড়াল।

জহর বললে—তোমাদের কি মুস্কিল, জানো, যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, এমন কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা কইছো কেউ যদি তা দেখল ত অমনি জাত গেল ! কেমন তাই নয়, বিজয়া ?

বিজয়া সরে এসে বললে—বাবা ঘুমিয়েছেন। মাও এখন উঠবেন না।

অর্থাৎ আলাপটা নির্ব্বিঘ্নে চলতে পারে !

আমি কি তাই বলছি আপনাকে ?

হেসে জহর বললে—কি তুমি বলতে চাও, তা আমি আজও বুঝলাম না! কিন্তু বোকা কোথায় ? বোকা ? সে যদি এসে পড়ে ?

এমনি কথা কই যদি তাতে কি দোষ ? ও আবার কি বুঝবে ?

জহর তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—সত্যি কথা বলবো বিজয়া ? তুমিও কিছু বোঝ না! এটা যে অন্যায় নয়, পাপ নয়, এর মধ্যে যে কোন লজ্জা নেই, ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই—তুমিও তা বোঝ না! সেই জন্যেই গাছের শব্দে তুমি চমকে ওঠো—জোরে একটু হাওয়া বইলে তোমার বুক কেঁপে ওঠে! মানুষের সঙ্গে মানুষের কোথাও যোগাযোগ নেই! কিন্তু মুস্কিল কি, জানো ? তোমার এই বয়স! এই বয়সেই মানুষের মনে যত সোরগোল, যত কোলাহল, যত সমারোহ। শুধু এই বয়সটাতেই চোখের জল ফেলেও আনন্দ আছে। এর মধ্যে লোকলজ্জা কোথায় ? তুমি যেখানে আমি ত সেখানে থাকবোই। বয়সের সঙ্গে বয়সের আলাপ করা, মেলামেশা করা—এটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সত্য! এ বয়সে পৃথিবীর চারিদিক

মনে হয় কত রহস্যে ভরা—সে রহস্য ভেদ করা হলো আমাদের বয়সের ধর্ম্ম! এমনি রহস্য ভেদ করেই পৃথিবীর সঙ্গে হয় আমাদের পরিচয়!...এ বয়সে মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের মেলামেশা করতে দিতে যারা নিষেধ তোলে, তাদের মনে কলুষ আছে—তাই তাদের মনে সব সময় সন্দেহ—যদি অন্যায় কিছু ঘটে! অন্যায় যা কিছু ঘটে, তা শুধু ঐ সন্দেহের ফলেই! নাহলে খোলাখুলি যদি এ মেলামেশা চলতে দেওয়া হয়, তাহলে অনর্থ বাধার ভয় থাকে না!

বিজয়া ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে ভিতরে চলে গেল। জহরও আর কোনো কথা বললে না। উঠে ঘরে তালা লাগিয়ে চাবিটা পরদার কাছে রেখে দিয়ে সেও রাস্তায় নেমে পড়লো। আকাশে তখন মেঘ করেছে। দূরে নারিকেল বনের বড় বড় পাতাগুলি সজল মেঘের ছায়ায় সাদা হয়ে উঠেছে। বর্ষণ হতে আর দেরি নেই!

কোথা যাওয়া যায়—ভাবতে ভাবতে জহর অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে কাছারি ঘরের পাশ দিয়ে সোজা গঙ্গার ধারে এসে হাজির হলো।

এদিককার গঙ্গা খুব চওড়া। এপার-ওপার যতদূর

দেখা যায়, গৈরিক রঙের জল ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না। হাওয়া উঠেছে। মেঘের সঙ্গে জলও ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে।

বটগাছটা জলের ধারেই। ঢেউ লেগে শিকড়ের মাটী ক্ষয়ে গেছে। জল বাড়লে আজও শিকড়ের মাটী টেনে নেয়। কিন্তু ঝড় এলে বাঁচবার প্রাণান্ত ব্যাকুলতায় এই বহুকালের বটগাছটি থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে।

তারই তলায় একখানি পাথরের ওপর জহর এসে চুপ করে বসলো। চারিদিকের নির্জ্জনতা দেখলে ভয় করে। অথচ এই নির্জ্জনতা ছাড়া তার জীবনে আর কোন সম্বল নেই!

জামার পকেট থেকে সে চিঠিখানি বার করলে। রাগিণী দেবীর নামের সেই চিঠি। খামখানির সুগন্ধ এত-পথ আসতে আসতে এখনও নিঃশেষ হয়নি। চিঠিখানি খুলে সে একমনে পড়তে লাগলো। কলিকাতার ভবানীপুর থেকে চিঠিখানা আসছে। আগাগোড়া একখানি প্রেম-পত্র! লেখার ধরণ দেখলে মনে হয় যুবকের লেখা। পরস্পরের এখনও বিবাহ হয়নি—কিন্তু অনেক দিন থেকেই প্রণয়ে আবদ্ধ! ছেলেটি সম্প্রতি বিলাতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হবার

চেষ্টায় আছে। বোধ করি বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে বিলাত রওনা হবে—এমনি একটা সম্ভাবনার কথাও চিঠিতে রয়েছে। কিন্তু সে যে সত্যিই প্রেমিক, তাতে আর সন্দেহ নেই। ভালোবাসা ছাড়া রাগিণীর কাছে সে যে আর কিছু চায় না—এই কথাটিতে সমস্ত চিঠিখানি ছেয়ে আছে। প্রেম-ভিক্ষার সে এক অপরূপ উচ্ছ্বাস! যেখানে নিজের কথা ফুরিয়ে গেছে, সেখানে ইংরেজি কবির কবিতা এসে পড়েছে।

এক জায়গায় লেখা—'আমার হাতের অক্ষর তুমি চেয়েছিলে, এতে আমার কত বড় আনন্দ, তা হয়ত তুমি জানো না রাগিণী! আমার হাতের লেখা যে আমার আগে তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছবে, এতে নিজের চিঠির ওপরেই আমার হিংসে হচ্ছে।'

তলায় নাম লেখা—নলিনীরঞ্জন!

ভালোই! একটি অপরিচিতা নারী আর একটি অপরিচিত নরের সঙ্গে শুধু স্নেহের বন্ধনে এগিয়ে চলেছে। দুজনের অবস্থাই সমান! যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের সম্বন্ধ—এই নিয়মই ত চিরকাল!

তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়েছে! জহর

নিঃশব্দে সেই দুকূলপ্লাবী নদীর দিকে চেয়ে বসে রইলো। পরস্পরের এই ভালোবাসার সম্বন্ধের মধ্যে তার যে উঁকি মারবার কোন অধিকার নেই, এ যে পাপ, এ যে শুধু নীচ কৌতূহল-বৃত্তি—এ কথা মনে করে ঘৃণায় তার সমস্ত মন ভরে উঠলো। এই হীনতা কতদিন যে কত রকমে কোথায় তাকে টেনে নিয়ে এসেছে, এ কথাও বারবার তার মনে হতে লাগলো। কিন্তু নিজের ওপর কোন হাত নেই যে তার! আশ্চর্য্য, মানুষ যে নিজের কাছেই নিজে সময় সময় কতখানি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, এ কথাটা কি কেউ ভেবে দেখে না?

বৃষ্টি ঘন হয়ে আস্‌তেই সে উঠে পড়লো। খানিক রাস্তা এসে বাঁ হাতি হোটেল। দুবেলা এইখানেই খেয়ে যেতে হয়। খোলার চালের একখানি ঘর। বৃষ্টিতে এরই মধ্যে ভিতরের চারিদিক প্যাচ-প্যাচ করছে।

ভাঙা নড়বড়ে তক্তাটার ওপর তখন দশ-পঁচিশ খেলা হচ্ছে। ভিতরে ঢুকতেই রামচন্দর বললে—আসুন দাদা, আসুন। আপনার জন্যে সেই থেকে—বলি ও পাঁচুর মা,

কোথায় গেলে? ঠাঁই-ঠুঁই করে দেও বাছা। চারটি খেয়ে ডেরায় গিয়ে উঠি।

রামচন্দর কাছারিতে মুহুরীগিরি করে। মাথায় তেল-জল দিয়ে টেরি কাটে। কাপড় ময়লা হবার আগেই সাবান দিয়ে কাচে। জুতো জোড়াটি দিনরাত চক্‌চকে করে রাখে। এদেশে এসে প্রথম দিনই হোটেলে বসে তার সঙ্গে জহরের আলাপ।

ঠাঁই হতে দুজনে খেতে বসলো। ভিতরের দাওয়ায় পাছে বৃষ্টি পড়ে সে জন্যে মাথার কাছটা দরমার ছাউনি। ওদিকে কতকগুলো নোংরা কাপড় শুকোচ্ছে—তার গন্ধে টেঁকা দায়। খিড়কী দরজার কাছে আঁস্তাকুড়ে যত রাজ্যের কলাপাতা, উচ্ছিষ্ট তরকারী, ভাত—তাই নিয়ে এই বৃষ্টিতে কতকগুলো পথের কুকুরের কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। সমস্ত জড়িয়ে চারিদিক যেন একটা বিষাক্ত আবহাওয়ায় ভরা। সে আবহাওয়ায় জহরের দম বন্ধ হয়ে এলো।

রামচন্দর অত গ্রাহ্য করে না। পরমানন্দে তার ভোজন চলছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে জহরের দিকে চেয়ে সে বলে উঠলো—বুঝলে তিনকড়ি, আজ

তোমার কড়ায়ের রান্নাটা তেমন ইয়ে হয়নি। সারাদিন খেটে-খুটে এসে ভাত চারটি যদি মুখে না রোচে, তাহলে— তুমিই বল না ভাই ?

পাঁচুর মা কোথায় ছিল, তাড়াতাড়ি এসে খানিকটা নুন জহরের পাতের কাছে রেখে গেল। নুন দিলে যে সবই সুস্বাদু হয়, এ কথা ঝিটি জানে !

হোটেলের মালিক তিনকড়ি খদ্দেরের খাবার সময়টিতে কি জানি কেন, সুমুখে থাকে না—ডাকলেও সাড়া দেয় না। যা করে পাঁচুর মা।

খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠে আসতে পাঁচুর মা দুজনকে দুটি পাণ দিয়ে গেল। বাইরের আকাশের দিকে একবার চেয়ে রামচন্দর তার জুতো জোড়াটি তুলে নিয়ে কাপড় ঢাকা দিয়ে বললে—আসুন !

অল্প অল্প বৃষ্টি তখনও পড়ছে। রামচন্দর তার অতি পুরাতন ছিদ্রবহুল ছাতাটি জহরের হাতে একপ্রকার গুঁজে দিয়ে বললে—তা হোক,—বিষ্টিতে ভেজা আমার অভ্যেস আছে। আপনাদের এসব সইবে না !

পথ অন্ধকার। চলতে চলতে এক সময় রামচন্দর বললে—আজ আপনার খাওয়াই হোল না দাদা।

কেন ?

হেসে রামচন্দর বললে—আমি ত কচি খোকা নই, সব বুঝতে পারি। কোন দিকেই আপনার এতটুকু স্থবিধে হচ্ছে না। এত কষ্ট কি আপনাদের মতন লোকের সহ্য হয় ?

কষ্ট ত মানুষেই পায় ! আমি কি মানুষ নই ?

উত্তেজিত হয়ে রামচন্দর বললে—মানুষ বলেই ত সহ্য করতে পারবেন না।

জহর মুখ তুলে একবার এই কদাকার কুৎসিত লোকটার দিকে চাইলে। রামচন্দর বললে—দেখুন, এই রামচন্দর আপনার ছাড়া আর কারো নয়, বুঝলেন দাদা ! আমি ঠিক জানি, এ সব আপনার কিছু ভালো লাগে না। চাকরীও ভালো লাগে না, এমন করে থাকাও ভালো লাগে না। অথচ কেন যে আপনি এমনি ভাবে—

জহর বললে—ভালো লাগে না, জানলে কি করে ?

রামচন্দর বললে—আমি মুখ্যু, কোনদিন লেখাপড়া শিখিনি, আপনার সঙ্গে কথা বলবার যোগ্য নই, তা বলে আমার ছুটো চোখ ত আছে ! আমি বেশ বুঝতে পারি, আপনি মস্ত বড় লোক, অনেক টাকার মালিক, ইচ্ছে

করলে আপনি অনেক লোককে চাকরী দিতে পারেন! কিন্তু—

হেসে জহর বললে—তোমার উপর শ্রদ্ধা আমার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, ভাই।

তার মানে, আমি মিথ্যে কথা বলছি? যা বলছি এর যদি একচুল মিথ্যে হয় ত আমি কৈবর্ত্তর ছেলেই নই! এই আমি ব'লে রাখলাম।

জহর বললে—আমার যদি এতই থাকবে, তবে সখ করে নিজের নাক কাট্‌ছি কেন?

কেন—অতি সহজ কথা! কিছুই আপনার ভালো লাগে না!

ঘরের কাছাকাছি এসে পৌঁছুতে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি এল। রামচন্দর বললে—উপরে গিয়ে দরজা খুলুন—আমি আসছি।

কোথায় চললে এই বৃষ্টিতে?

রামচন্দর তখন ছুটে চলে গেছে।

উপরে উঠে দরজা খুলে জহর যখন আলো জ্বাললে তখন কি জানি কেন, চোখ দুটি তার ছল্‌ছল্‌ করে উঠেছে। মনে হলো, অকস্মাৎ তার দেহ-মনের সমস্ত শক্তি

নিঃশেষ হয়ে গেছে! আর সে পারে না! নিজের জীবন নিজের কাছেই যে এত বড় মর্ম্মান্তিক বোঝা, একথা হয়ত সে জানতো না!

জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট্ আসছিল। জহর নিঃশব্দে সেই দিকে চেয়ে বসে রইলো। মনের এ একরকম অবস্থা। কোনদিকে কোন অবলম্বন নেই! অর্থহীন দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থাকা! কিন্তু আজকের এই অন্ধকার নির্জ্জন রাত্রির অবারিত প্লাবনের একান্তে কোথায় কে একটা উন্মাদ গায়ক গান ধরেছিল,—

'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে—
সকল অপরাধ হে আমার
ডুবাও চোখের জলে!'

দরজা ঠেলে রামচন্দর এসে ঢুকলো। সর্ব্বাঙ্গে তার বৃষ্টির জল। হাতে এক ঠোঙা দোকানের খাবার।

এ কি তোমার পাগ্‌লামি রামচন্দর? একটা মানুষ ক'বার খায়?

একবার খায়, দাদা। উপোস করে কেউ থাকে না!

জহর হঠাৎ বললে—আচ্ছা রামচন্দর, আমায় খুব অপরাধী বলে মনে হয়—কেমন ?

অপরাধী ! আপনি ? কত লোক বর্ত্তে যায় আপনাকে দেখলে !

বাঁচা গেল ! তুমি না থাকলে আজ হয়ত আমি পাগলই হয়ে যেতাম ! নিয়ে এসো, কি খাবার এনেছ ভাই,—দেখি !

হেসে হেসে রামচন্দর অনেক কথাই বলে। একটা কোন মানুষকে পেলেই সে নিজের কথা বলতে সুরু করে দেয়। শ্রোতার ধারণার দিকেও দেখে না—ধৈর্য্যের দিকেও তাকায় না। সে যে কথা বলছে, এইতেই তার তৃপ্তি।

কত ছোটবেলায় তার মা-বাপ মারা যায়, কেমন করে বড় হয়, কবে তার বৈমাত্রেয় ভাই ঘর থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়—তার গল্প ! কলকাতা শহরে নাকি একবার গিয়েছিল, কিন্তু কোন্ একটা রাস্তার চৌমাথায় একখানা জ্যান্ত হাওয়া গাড়ী তাকে তাড়া করে, সেই থেকে নাকে খৎ দিয়ে কি একটা প্রতিজ্ঞা করে ফিরে এসেছে।

জহর তখন কাগজ-কলম নিয়ে এক-মনে কি লেখে! রামচন্দর এক সময় বলে—আপনি বোধহয় শুনচেন না দাদা?

শুন্‌ছি। জহর বলে। কিন্তু কাগজের উপর তার কলম চলে!

রামচন্দর বলে—হাত-ঘড়িটা আপনার পড়েই থাকে, কই, হাতে পরেন না ত!

এই হাত-ঘড়িটির কথা দিনে অন্ততঃ বার-দশেক জহর তার মুখে শোনে। মুখ তুলে হেসে জহর বলে—ঘড়িটা তোমার ভারি পছন্দসই—না?

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মুখখানায় এক-মুখ হেসে রামচন্দর বলে—সত্যি দাদা, ভারি চমৎকার! আমার ইচ্ছে করে—

কিন্তু কি যে ইচ্ছে, সে কথাটা আর স্পষ্ট সে বলতে পারে না! অন্য কথা পেড়ে বলে—আশ্চয্যি লোক আপনি! আপনাকে দেখে কিছুই বোঝবার যো নেই। ওই যে অত দামের জামা-কাপড়গুলো পড়ে পড়ে মাটি হচ্ছে, আপনার হুঁশই নেই! পরেনও না, তুলেও রাখেন না।

শ্রোতার দিক থেকে ভালোমন্দ কোন উত্তর না

পেয়ে রামচন্দর আর কিছু বলে না। আস্তে আস্তে উঠে দরজার কাছটিতে বসে জহরের চটি জুতো জোড়াটি ঝেড়ে মুছতে থাকে।

জহর একবার মুখ ফিরিয়ে বলে—ও কি হচ্ছে, রামচন্দর! না, না, ও সব করো না। বড় যদি হতে না পারো ক্ষতি নেই, কিন্তু ছোট হয়ো না ভাই। আমাকে স্নেহ করবার আরো অনেক উপায় আছে। ও কাজ করো না।

কাজটা ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে! রামচন্দর বলে—আপনি যেমন সব কথা তলিয়ে ভাবেন, আমি তা পারিনে দাদা। নিজেদের কাজ নিজেরা না করলে করবে কে, বলুন ত?

দাদা হঠাৎ হেসে বলে—ঠিক কথা! কিন্তু সংসারে হিতৈষীর সংখ্যা কবে কম্‌বে তাও জানিনে, ভাই!

হোটেল থেকে দুজনে সেদিন বেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই রামচন্দর বললে—কই, পাণ ত আপনি খেলেন না দাদা! পাঁচুর মা পাণ সাজে ভালো—খান্‌।

সে আমি ফেলে দিয়েছি!

বিস্মিত হয়ে রামচন্দর বললে—ফেলে দিয়েছেন ?

মেয়েদের হাতের সাজা পাণ কেউ যে না খেয়ে ফেলে দিতে পারে, এ অন্যায় ধারণা রামচন্দরের নেই! একটু থেমে সে বললে—কিন্তু সেদিন ত দোকানের পাণ কিনে খেলেন !

জহর হেসে বললে—সেটা পাঁচুর মা'র হাতের সাজা নয়। আমার ওই একটা দোষ আছে রামচন্দর—বুঝলে ? কালো কুৎসিত মেয়েদের দিকে আমি কেমন তাকাতেই পারি না। তাদের সম্বন্ধে আমার কোন বিবেচনা নেই। তাদের হাতের পাণ খাওয়া চুলোয় যাক্, পৃথিবীতে যে তারা থাকে, এও আমার অসহ্য !

কি আপনি বলছেন দাদা! এ যে ভগবানের—

তাই ত বলছি—ভগবানের অক্ষমতা! তা বলে সেই অক্ষমতার পাপ যে আমাদের ঘাড়ে নিতে হবে, তার কি মানে ? কিছু মনে করো না রামচন্দর, সুন্দর ছাড়া সংসারে আমি আর কিছু সহ্য করতে পারিনে। তা সে সুন্দরের মধ্যে যত পাপ, যত অন্যায়, যত কলঙ্কই থাকুক না কেন !

একটুখানি হেসে জহর আবার বললে—পাঁচুর মা'র যদি

আজ রূপ থাকতো, তাহলে হয়ত আমিই তাকে পাণ সেজে খাইয়ে আসতাম !

এমনি করে কথায় কথায় মেয়েদের কথা উঠলো। কিন্তু জহরের ধারণা ও বিশ্বাসের দিকে চেয়ে একদিকে রামচন্দর যেমন অবাক হয়ে গেল, তেমনি তার খানিকটা ভালোও লাগছিল। এ ভালো লাগার মধ্যে অস্বস্তিও আছে বৈ কি।

বাসায় এসে রামচন্দর বললে—আকাশের চেহারা ভালোই আছে। চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি, দাদা।

বেড়িয়ে ? তা চলো।

রামচন্দর এদিক-ওদিক চেয়ে জামা-কাপড় হাতড়াতে লাগলো। এক সময় বললে—দেখুন দাদা, দুঃখী লোকদের জব্দ করে এক ভগবান আর এক ধোপা। কদিন হলো, কাপড় নিয়ে গেছে। কিন্তু আজও—

কাপড় চাই নাকি তোমার ? দাঁড়াও, দিচ্ছি।—বলে জহর তার বাক্স খুলে ভালো ধোয়া একখানি জরিপাড় কাপড় বের করে দিল।

কাপড় ত দিলেন। কিন্তু জামা ?

নিশ্চয়, নিশ্চয়।—তৎক্ষণাৎ জহর তাকে একটি গরদের পাঞ্জাবী বের করে দিয়ে বললে—এইবার তোমায় ঠিক মানাবে!

রামচন্দর বললে—আপনার ঠাট্টা এবার বুঝতে পেরেছি দাদা।

পেরেছ নাকি?

সত্যি বলছি।—কিন্তু দেখুন, আমি ভালো দেখতে নই—তা আমি কি করবো, বলুন?

রামচন্দর বেশ করে গুছিয়ে জামা-কাপড় পরতে লাগলো। জহর তার সোণার বোতামের সেটটা বার করে তার জামায় লাগিয়ে দিলে।

রামচন্দর আনন্দিত মুখে বললে—আমার সেই পাম্পসু জোড়াটা আজ পরি—কেমন দাদা?

ঠিক বলেছ, তাই পরো। আজকের লগ্ন বড় ভালো!

একটু পরে তার সজ্জিত কৃষ্ণবর্ণ চেহারাটার দিকে চেয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত জহর বললে—যে মেয়েরা দেখতে ভালো নয়, তারা এত গয়নাগাটি পরে কেন, জানো? এ সব না পরলে তাদের দিকে কেউ ফিরে তাকাবে না। তাদের সকল ব্যবহারের গোড়ার কথা হচ্ছে—মানিয়েছে কি না!

ঘর থেকে বেরোবার সময় জহর বললে—ভালো কথা, হাত-ঘড়িটাও আজ হাতে পরে নাও রামচন্দর। আজই পরবার দিন।

তা দেখুন দাদা, আমি কোনদিন আপনার অবাধ্য নই। তা যদি—

হাঁ হাঁ—বাদ-বাকি কথাটা বেশ বুঝে নিতে পারবো। ঘড়িটা এখন হাতে পরে ফেল, দেখি।

রাস্তায় নেমে জহর বললে—আজ উলু দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, রামচন্দর, তোমাদের এ রোগের একমাত্র ওষুধ হচ্ছে, বিয়ে করা!

রামচন্দরের কোথায় আঘাত লাগলো, কে জানে। সে বলে উঠলো, বিয়ে! বিয়ে আমাদের কে দেবে? আপনিই বলুন না, এই বিদেশে-বিভুঁয়ে চাকরী করে একা-একা কি সুখ আমাদের! বাসায় থাকি, আফিসে খাটি, হোটেলে খাই। এমনি চিরকাল দাদা, যতদিন বাঁচবো! কত লোককে কন্যেদায় থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছি, বলেছি এক-পয়সা চাইনে ভাই, তোমার মেয়েটি শুধু দাও। দেয়নি—আমার চেহারা দেখেই বোধ হয়! বলুন ত, আমার চলে কি করে? মেয়ে নই, তবু সংসার করছি।

এ কি বলুন ত দাদা ? যার পা নেই, সে চলে বেড়ায় কি ক'রে ?

হাটতলা পেরিয়ে দুজনে অনেকটা রাস্তা এসে পড়েছিল। বাঁহাতি বাঁক নিতেই জহর বললে—ভারি অন্ধকার যে ! এ পথে আলো নেই কেন ?

রামচন্দর একটু হেসে বললে—আলোর দরকার হয় না দাদা।

তাই নাকি ? ভারি খাসা জায়গা ত। তুমি গেলে বোধ করি সব জায়গায়ই আলো হয়—কি বলো রামচন্দর ?

রামচন্দরের আর কোন কথা শোনবার অবস্থা ছিল না। এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে ফস্ করে জ্বেলে বলে উঠলো— দেখুন দাদা, দেখুন একবার—আপনি যে বলছিলেন আমার পছন্দ নেই, বিনুকে আমাদের দেখুন একবার। বিনু, তোমাকে বেশ মানিয়েছে, মাইরি !

গলির ডানদিকে সমস্তটাই একসারি ছোট-ছোট পাতার ঘর। স্বল্পালোকিত পথের ধারে জহর দেখলে, নানা বয়সের কতকগুলি মেয়ে—এই অন্ধকারে দাওয়ার খুঁটি ধরে এতক্ষণ তাদেরই পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যস্ত হয়ে রামচন্দর বললে—আর কথা নয়, বিন্নু, ঘরে গিয়ে আলোটা জ্বালো ত ভাই!

দুজনে দাঁড়িয়ে রইলো। একটি মেয়ে উঠে ঘরে গিয়ে বোধ করি আলো জ্বালবারই চেষ্টা করতে লাগলো। রামচন্দর মুরুব্বির মত বিরক্ত হয়ে বললে—আঃ, একটা দেশলাইও কি তোমার নেই, ছাই? কতদিন তোমায় বলেছি যে! সরো দিকিন্। আমিই জ্বেলে নিতে পারবো!

ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে মুখ ফিরিয়ে চুপি চুপি রামচন্দর বললে—তবে নাকি তুমি সাজতে জানো না? এই ত বেশ মানিয়েছে বিন্নু। ওঁদের নজর উঁচু, পছন্দও উঁচু। ভালো করে দাদার সঙ্গে কথা বলো কিন্তু। যে মেয়েরা কথা বলতে জানে না তাদের সঙ্গে উনি বিশেষ—বুঝলে কি না!

বিন্নু বললে—শিখিয়ে দাওনা কি বলতে হবে?

তবেই হয়েছে! রামচন্দর হেসে বললে—আর সব শেখাতে পারি বিন্নু, কিন্তু ওই কথাগুলো কেমন ক'রে শেখাতে হয়—

পরে চট্ করে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—

আসুন দাদা—আসুন। আপনি যে দয়া করে আসবেন—দাদা—তাইতো গেলেন কোথায় ? ও দাদা !

বাইরে এসে রামচন্দর দেখলে, দাদা কোথাও নেই।

একটি মেয়ে তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে একবার বললে—গেল কোথায় ওদিকে,—দেখনা এগিয়ে !

রামচন্দর রাস্তায় পড়ে এগোতে এগোতে একেবারে সেই গলির মুখে এলো। জহর সেখানে দাঁড়িয়েছিল। বললে—যাই বলো রামচন্দর, রসভঙ্গ করিনি—অপেক্ষাই করছি। এরই মধ্যে চলে এলে ?

ঢোক গিলে রামচন্দর বললে—আপনি চলে এলেন ? এই যদি আপনার মনে ছিল, তাহলে আগে থাকতেই—

জহর বললে—আমার বেড়াবার কথাই ছিল, এখানে আসবার কথা কি ছিল রামচন্দর ?

কিন্তু বিনোদিনীকে যদি দেখতেন একবার ! এমন রূপ—আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এ পাড়ায় কোথাও এমন—

জহর বললে—পাড়ায় কেন, চোখের নিমেষে দেখে যা বুঝলাম, মনে হলো, এ মুলুকে অমন সুন্দরী নেই !

তবে ? বলুন দাদা,—দেখুন তাহলে—

জহর বললে—তাইত বলছি রামচন্দর, আমার কথা বুঝতে পারলে দেখতে ওরা সুন্দর কিন্তু কোন সৌন্দর্য্য নেই ওদের। ওদের রূপ আছে কিন্তু রস নেই। রামচন্দর, কোন্ সাহসে ওদের কাছে যাবো, বলতে পারো ?

এতে সাহসের কি আছে, দাদা ? একটুখানি আনন্দ—

তা বটে ! আনন্দ ! রামচন্দর, একটা টাকা পেলেই যদি পুরুষকে আনন্দ দেওয়া যায়, তাহলে দেখতে পৃথিবীর সব মেয়েই ওই দলে যেত। তা হয় না ! বুঝলে ? আমি যা বলবো, সে তাই করবে ; আমি যা চাইবো, সে তাই দেবে ; আমি শুধু হুকুম করে যাবো, সে হুকুম সে পালন ক'রে চলবে—এর মধ্যে আনন্দ কোথায় ? যাকে জয় করতে পারবো না, ইচ্ছার আকর্ষণে যে ধরা দেবে না, মন দিয়ে যাকে পাবো না—তার কাছে আনন্দের আশা ? মেয়েদের এতবড় অপমান করবার সাহস আমার নেই, রামচন্দর !

জহর নিজের পথ চলতে লাগলো।

ভালো বিপদ যাহোক। এটা রসভঙ্গ নয়ত কি ! রামচন্দর তার সঙ্গে কয়েক পা গিয়ে বললে—বাড়ী যাচ্ছেন নাকি ?

বাড়ীতে নয়—বাসায়।

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ। পরে রামচন্দর বললে—এর পর আমারও আর ভালো লাগবে না। এ যদি হয় দাদা, চলুন, তবে আমিও যাই।

অন্ধকার পথে চলতে চলতে ফোঁস করে একটি নিশ্বাস ফেলে রামচন্দর পুনরায় বললে—কি যেন একটা গোলমাল হয়ে গেল দাদা—নয় ?

চলতে চলতে জহর বললে—আমার ত কিছুই—

পূর্ব্বকথার সূত্র ধ'রে রামচন্দর হঠাৎ বললে—কিন্তু মেয়ে ত আমাদের চাই দাদা, কি বলেন ? মেয়ে নৈলে আমাদের দাম কি ? কি নিয়ে এই চব্বিশটা ঘণ্টা কাটে ? এ কথাটি কি কেউ ভেবে দেখে দাদা ?

সর্ব্বনাশ ! এ যে পাগ্‌লা কুকুরের অবস্থা ! জহর হেসে ফেললো।

না দাদা, এ সত্যি কথা ! এই আপনার গা ছুঁয়ে,—আমাদের মতন সকলেরই একটি ক'রে মেয়ে চাই। মনের মতন মেয়ে পেলে আমাদের অনেক রোগ সেরে যাবে। কিন্তু—

জহর বললে—তা বলে ও জায়গা ভিন্ন তোমার আর মেয়ে জুটলো না ?

রামচন্দর বললে—তবে কি গেরস্থর মেয়ের কথা বলছেন ? হরি, হরি, জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেই যাদের জাত যায়। তারা,—

জহর বললে—একটা বিয়ে করো না কেন, রামচন্দর ! বাঙলাদেশে অন্নবস্ত্র অর্থ বাড়ী গাড়ী খ্যাতি মান—সব কিছুর অভাব খুব, জানি—কিন্তু বাঙালী পুরুষের বৌয়ের অভাব কোন কালে ছিল না—এখনো হবে না ! সত্তর-আশী-বছর বয়সের পুরুষ-মানুষও মনে করলেই বৌ পায়—আর তুমি পাবে না ?

একটা নিশ্বাস ফেলে রামচন্দর বললে—কোথায় আর পেলাম দাদা ! কত লোককে সেধেছি তো ! নাঃ, আমার কোষ্ঠীতেই বোধ হয় ভগবান বৌয়ের ঘরটা শূন্য রেখে আমায় ভারতে পাঠিয়েছেন ! নাহলে আর—

এমনি কথা বলতে বলতে দুজনে পথ পার হয়ে এলো।

ওদিকে সেই অন্ধকার গলির সেই কদর্য্যতার মধ্যে বসে বিনু আলো জ্বেলে এ দুটি পথিকের আশায় সাগ্রহে পথের পানে চেয়ে আছে !

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়, কেউ আসে না। তন্দ্রাচ্ছন্ন

দৃষ্টি তুলে বিনু মাঝে মাঝে সেই অন্ধকার পথের দিকে তাকায়। এই অপেক্ষা করাটাই হচ্ছে সব চেয়ে বেশী কষ্ট-দায়ক এবং লজ্জাকর। বোধ করি এমনি একটা কিছু ভাবে—

ঘরে ঢুকে রামচন্দর বললে—বৃষ্টি আসতে আর দেরি নেই। সকাল সকাল ঘরে এসে ভালোই হোল! ও কি…

জহর তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষ-পত্র গুছোচ্ছে। বললে—কি?

ও সব কি কচ্ছেন?

বাক্স বন্ধ করতে করতে জহর বললে—যেতে হবে।

যেতে! কোথায়?—রামচন্দরের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো।

দেখি, যদি কোথাও আশ্রয় মেলে।—বলে জহর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নির্ব্বাক বিস্ময়ে রামচন্দর হতভম্ব হয়ে রইলো।

একটু পরেই একটা লোক নিয়ে জহর ঘরে ঢুকলো। পরে তার মাথায় বাক্স আর বিছানাটা তুলে দিতেই রামচন্দর বললে—আজকের রাতটা অন্ততঃ থেকে গেলে হতো না?

হেসে জহর বললে—না ভাই, আর একদণ্ড নয়।

কেন যে যাচ্ছেন, তা ত বললেন না! দেখুন, যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে—

পাগল! জহর বললে—যাচ্ছি এমনিই। কেন—আজ অবধি কাউকে 'কেন'র উত্তর আমি দিইনি। আমি নিজেও এর উত্তর জানি না।

বাইরে তখন সশব্দে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। সেইদিকে একবার চেয়ে রামচন্দর বললে—বিষ্টিটা ধরলে না হয়—

ধন্যবাদ।—আসি তাহ'লে।

মুটের মাথায় জিনিষ চাপিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে জহর পথে এসে নামলো। ঝমঝম করে তখন চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে।

এত বৃষ্টিতে তার কোন গ্রাহ্য নেই! নিজের পথ ধরে চললো।

রাস্তার মোড় পার হতেই পেছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে রামচন্দর বললে—যাচ্ছেন ত এগুলো আপনি রেখে গেলেন কার জন্যে? এসব আপনার নিন বুঝে পড়ে'।

জহর ফিরে দেখলে, পুঁটলিতে বাঁধা সেই জামা-কাপড়, সোণার বোতাম, হাতঘড়ি সমস্তই রামচন্দর ফেরৎ এনেছে।

বললে—ওসব আর আমি নিতে পারি না রামচন্দর ! সমস্তই আমি তোমায় দিয়ে দিয়েছি।

দুজনেই বৃষ্টিতে ভিজছিল। সজল চোখে রামচন্দর বললে—আমি আপনার কাছে চেয়েছিলাম কিছু? আর দিলেই বা আমি নিতে যাবো কেন, দাদা ? আমি আপনার যোগ্য নই বলে' কি আমি ভিখিরি ?

জহর তার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললে—যা তুমি বললে ভাই, তার এতটুকু মিথ্যে নয়। কিন্তু এ ত' আমার দয়ার দান নয় ভাই,—এ আমার ভালোবাসার চিহ্ন। এ আমার দেওয়া নয়—এ তোমার পাওয়া !—যাও, ঘরে যাও, এত জলে ভেজা হয়ত তোমার সহ্য হবে না।

জহর আবার চলতে লাগলো। আর একটিবারও ফিরে তাকালো না।

সেই বৃষ্টির মধ্যেই খানিকটা পথ এসে সরু একটা গলিতে সে ঢুকলো। গলিটায় যেমনি জল, তেমনি কাদা, সর্ব্বত্র যেমনি সপ্‌সপে, তেমনি কর্দ্দমাক্ত।

অতি জীর্ণ একখানি বাড়ীর নীচের পড়ো ঘরটায় তখন কতকগুলো ছেলে চেঁচামেচি কচ্ছিল। বোধ করি, সখের থিয়েটারের মহলা চলেছে—তার সঙ্গে কে একজন কদর্য্য

ভাষায় স্বরচিত সঙ্গীত সাধনা কচ্ছে। তাস পেটার শব্দটাও সংযুক্ত।

জানালার কাছে মুখ দিয়ে জহর বললে—সন্তোষবাবু ?

সন্তোষ একপাশে বসেছিল। সে এদেরই সমবয়সী। ছেলেটি ভারি ভদ্র। এই বাড়ীরই কর্ত্তা সে—মুখ বাড়িয়ে বললে—জহরবাবু নাকি ?

বলতে বলতেই বেরিয়ে এলো। জহর বললে—আপনার কাছেই আপাতত—

পাশে মুটের মাথায় বাক্স দেখেই সন্তোষ বললে—আর কোন কথা নয়, ভেতরে আসুন। কতদিন ধরে পথে-ঘাটে আপনাকে বলছি, আজ আপনার দয়া হলো। আমরা গরীব জহরবাবু, কিন্তু আমরা গেরস্থ। ধোঁয়াটে লোক নই। লোকের খাওয়া-থাকার কথাটা আগে ভাবি।

জিনিষপত্তর নাগিয়ে দিয়ে মুটে বিদায় হলো।

খাওয়া হয়নি তা'ত দেখতেই পাচ্ছি। পাঁচ মিনিটে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কোন ভাবনা নেই। আমরা ডেলি প্যাসেঞ্জার। পাঁচ মিনিটে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমরা ট্রেণ ধরি।—কাপড়-জামা সবই ভিজে গেছে, দেখছি।—বলতে বলতে সন্তোষ অন্দরে ছুটলো।

ক্লাবের দু'একজন সভ্য বলে উঠলো,—আমাদের থিয়েটারে এব্যর কিন্তু একটা পার্ট আপনাকে নিতে হবে —কি বলেন ? রাজার পার্ট আপনাকে বেশ মানাবে।

বেশ ত, ভালো কথা। ওটাই বা বাকি থাকে কেন! —জহর হাসতে হাসতে বলে।

আপাতত এইখানেই।

প্রতিদিন রাত বারোটা অবধি ক্লাবের কার্য্য পরিচালনা ,হয়। অর্থাৎ এ-পাড়া ওপাড়ার কতকগুলো কেজো ও অকেজো যুবক কি একখানা বটতলার নাটকের মহলা দেয় —নানা ভাষায় খোলাখুলি মুখ খিস্তি করে, পাড়ার মেয়েদের নিয়ে নিজ নিজ কাল্পনিক প্রেমালাপের ফর্দ্দ তুলে ধরে, এর ওপর আবার রসিকতার অপূর্ব্ব চেষ্টা! কেউ তাস পেটে, কেউ দাবা খেলে, কেউ বা আড় হয়ে 'সৈঁইয়া' ধরে। যার এসব কোন বালাই নেই, সে তক্তা চাপ্‌ড়ে তব্‌লার বোল ছাড়ে। এ ছাড়া বিড়ির ধোঁয়া প্রমুখ নানারূপ দুর্গন্ধে এই নোংরা, এঁদো, কুৎসিত ঘরখানি কয়েকঘণ্টা যেন মুখর হয়ে থাকে।

জহর নিঃশব্দে বসে চারিদিকে এক একবার তাকায়। বোধ করি ভাবে—এরাই সত্যিকারের রসগ্রাহী, এরাই দেশের আশা!

সন্তোষ বলে—ওঠো না ভাই, আর কেন! রাত যে বারোটা বাজতে চললো!

কিন্তু কেউ ওঠে না। গৃহস্বামীর ভালো না লাগায় তাদের কিছু যায় আসে না। আড্ডা ভিন্ন যাদের আর কোন সম্বল নেই, আড্ডার সময় পরিমাপ করতে গেলে তাদের চলে না।

তবু একজন উঠে দাঁড়ায়। সে মোহিত। এখানকারই জমিদার-বাড়ীর ছেলে। আদব-কায়দায় বেশ দুরস্ত। দুনিয়াটা কেমন করে চলছে, একথা তাকে জিজ্ঞেস করলে বেশ উত্তর পাওয়া যায়। সে যে ভবিষ্যতে জমিদার—সে সম্বন্ধে ভারি সচেতন। অহঙ্কার বিশেষ নেই। কিন্তু—ওই কিন্তুটা নিয়েই সে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে। দেখলে মনে হয়, মানুষের সঙ্গে সে ভদ্র ব্যবহার করবার চেষ্টাই করে।

সন্তোষ বলে—চললে জমিদার?

হ্যাঁ, গুড্ নাইট্।—বলে জমিদার চলে যায়।

বাকি লোকগুলো যখন যায়—তখন অর্দ্ধেক রাত।

সন্তোষ সেইখানেই নিজের হাতে বিছানা করে দেয়, মশারি টাঙায়, হাতের কাছে দেশলাই রেখে দেয়। বলে—তা হোক, এ-সব আমার অভ্যেস আছে। আমার ঘরে যে আপনি থাকবেন, এ কি আমার পক্ষে কম কথা!

সংসারের কথাও এক-আধটা বলে। সে নিজে কেরাণী—নিজেই সংসার চালায়। কলিকাতায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে। ছোট ভাইকে লেখাপড়া শেখাতে হয়। ভারি কষ্টের সংসার।

মুখের দিকে চেয়ে একবার বলে—তবু বেঁচে আছি মশাই। যাবে, এমনি করেই দিন কেটে যাবে। চাকরিটুকু থাকলেই যথেষ্ট। ভগবানকে আর কষ্ট করে মুখ তুলে চাইতে হবে না। কি বলেন, জহরবাবু?

জহর হেসে বলে—তাঁর সময়ও নেই মুখ তুলে চাইবার! মা-বসুমতীকে ত্যাগ করে মঙ্গলগ্রহে তিনি এখন সৃষ্টিকার্য্য নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমরা সব সতীন-পো!

সন্তোষ হো-হো করে হেসে ওঠে।

যাবার সময় বলে—রাত্রে আপনার বই পড়া অভ্যেস। কিন্তু আজ থাক, এত রাত্রে পড়া আরম্ভ করলে সূর্য্যদেব লাফিয়ে উঠবেন! আজ ঘুমোন। আমিও মট্‌কা মারি গে।

মাসের পর মাস ঘুরে যায়। প্রমীলার ছোট মনটি ছোট ঘরখানির মধ্যে ফুলে ফেঁপে ওঠে। বর্ষাকালও শেষ হয়ে এলো বৈ কি। দিন-দিন তার ভেতরটা যেন নির্জ্জন হয়ে আসছে।

ঘরকন্না করার মধ্যে একটুখানি সোরগোলও হয়তো আছে! প্রতিদিনের খানিকটা সময় তাইতেই মুখর হয়ে থাকে। ফাঁক যেখানে থাকে, সেইখানেই ফাঁকা হয়ে ওঠে। কল্পনা ছাড়া সে ফাঁকি পূরণের উপায় থাকে না।

কাজকর্ম্মে কেমন যেন ঢিলে পড়ে। সবই তেমনি আছে: সেই ঘর, সেই সাজানো সংসার, সংসারের প্রতি সেই মধুর মমতা—সবই তেমনি! কিন্তু যে বস্তুটি নেই—চলতে ফিরতে প্রমীলা তারই দিকে তাকায়। এই ছোট্ট না-থাকাটুকু যে কতখানি না-থাকা, সে তাই ভাবে। স্বপ্ন

আছে নিদ্রা নেই, আরাম আছে তৃপ্তি নেই, ইচ্ছা আছে শক্তি নেই—ক্রমাগত কেবল একটা নেই!

তার এই ছোট জীবনটি, জীবনের ছোট কল্পনাটি, এবং কল্পনার ছোট প্রসারটি—এর মধ্যে অতগুলো অভাব যেন ধরে না! অথচ সত্যি কথা বলতে কি, নিজেকে অসুখী ভাবতে গেলেও প্রমীলার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়! অসুখী সে কোন দিনই নয়!

কিন্তু এদেরই মাঝে নারীর সেই অনন্ত আক্ষেপ—আজও সে এলো না কেন!

সে যে কে এবং কেন যে আসে না—এ কথার উত্তরই বা আজ অবধি কে দিয়েছে?

প্রমীলা বাইরে গিয়ে বসে। বসেই মনে হয়, আর যেন তার ওঠবার শক্তি নেই! দরজা দিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। দূর-পথে লোকজনের চলাচলও বড় একটা নেই। মাঝে মাঝে শুকনো ধুলোর সঙ্গে ঝরা পাতাগুলি এখানে ওখানে উড়ে বেড়ায়।

হয়তো ভাবে, এই যে অপেক্ষা, এর কোনো অর্থ নেই! সারা জীবনই হয়তো এমনি অপেক্ষা করে থাকতে হবে—কিন্তু কোনো দিনই এর অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উদাসী তপ্ত হাওয়ার যেন একটা মোহ আছে। অকারণে চোখে জল টেনে আনে। জীবনের সকল লাভকে সরিয়ে দিয়ে সে শুধু জানায়—কি তোমার হারিয়েছে! প্রমীলা ভাবে, এইটিই হয়তো সত্যি কথা! যেটা হারিয়ে যায়, তারই ওপর ত সবখানি অধিকার! নিজের দখলের মধ্যে যেগুলো আছে, সেগুলো ত আছেই—হাত বাড়ালেই তাদের পাওয়া যায়। কিন্তু যেটা নেই, সেটা হাতের মধ্যে নেই, গণ্ডীর মধ্যে নেই, কল্পনাতে নেই, আকাশে নেই—কোথাও সে নেই! কিন্তু সেইটাই যে সকলের আগে চাই।

এক-একটি মেয়ে থাকে, তারা ঠিক হরিণীর জাত। ঘুরছে, ফিরছে, আনন্দ কচ্ছে, ঘরকন্নাও কচ্ছে,—কিন্তু আগন্তুকের পদধ্বনির অপেক্ষায় তাদের মন, দৃষ্টি,—সকল ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে থাকে! তাদের এত তোড়জোড়, এত সাজ, এত আনন্দ সব একটি বিশেষ মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হয়ে যাবার অপেক্ষায় বসে থাকে! তারা ভালোটাও জানে, মন্দটাও জানে, কিন্তু সেই সুদূর দুষ্প্রাপ্য বস্তুটির সন্ধান পেলে তারা সকল ভালো-মন্দের অতীতে গিয়ে দাঁড়ায়!

পিছন থেকে বাসুদেব বলে—কাজ না থাকলে সময়টা তোমার কাটতেই চায় না! না প্রমীলা?

প্রমীলার আজকাল একটু জ্ঞান হয়েছে। বলে—কে বললে ?

না, তাই বলছি—আমার ঐ পাখীগুলো আর পুষি বেড়ালটা যদি না থাকতো, তাহ'লে—

প্রমীলা মুখ ফিরিয়ে নেয়। বাসুদেব বলে—দেখি, ছাগলটা আবার কোথায় গেল ! যে রকম দামৃবেলে হয়েছে, ধরে' একদিন না কেউ খেলে বাঁচি !

বলতে বলতে সে চলে যায়।

রাগে প্রমীলা গিস্-গিস্ করতে থাকে। রাগটা স্বামীর ওপর নয়, সব ওই নিরীহ পশু-পক্ষীগুলির ওপর। ওরাই ত ওঁকে ভালোমানুষ পেয়ে এই সুবিধেগুলো নিচ্ছে !

প্রথম শরতের আকাশ ওদিকে গাঢ় নীল হয়ে ওঠে। তারই তলায় দূর নদীর বাঁকে তমাল বন-রেখা। আকাশের কিনারায় সাদা মেঘ দেখা যায়। মেঘ, না, কাশের বন ! আর ওই নদী—ওর কি এতটুকু বিশ্রাম নেই ? মা গো মা—চারিদিক থেকে একটা মন-কেমনের চাপা কান্না যেন ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে !

প্রমীলা উঠে দাঁড়ায়। ঘর পেরিয়ে বারান্দায় এসে

বলে—বলি, ও কি হচ্ছে ? ছাগল নিয়েই থাকো তবে ! ওইটুকু ছাগলের বাচ্চা দিনে কবার খায়, শুনি ?

বাসুদেব বলে—আমিও তাই ভাবচি মীলা, এতবার করে' খাওয়াচ্ছি কিন্তু বাবুলালের অরুচি নেই !

ছাগলটির আদরের নাম বাবুলালই বটে !

প্রমীলা সরে এসে পেছন থেকে বাসুদেবের গলা জড়িয়ে ধরে। মুখের ওপর মাথাটাকে নুইয়ে গালের ওপর গাল রেখে বলে—ছাগল, বেড়াল, টিয়াপাখী ছাড়া কি তোমার আর চিন্তা নেই ?

তাইত ! এও একটা কথা বটে ! বাসুদেব বলে—ওরা যে কথা বলতে পারে না মীলা, নৈলে দেখতে ! কে বলে আমার চিন্তা নেই ? তোমার চিন্তাই আমার সকলের চেয়ে বড়। কিন্তু জানো ত প্রমীলা—ওরা কথা বলতে জানে না !

প্রমীলার এ সব কথা শোনবার বিশেষ প্রয়োজন নেই। সে বললে—আচ্ছা, জহর কবে আসবে, জানো ?

জহর !—বাসুদেব এক-মুহূর্ত্তে যেন সুদূরে চলে গেল ! উত্তর দেবার আগে মুখ তুলে দেখলে, দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু যেন প্রমীলার মুখের ওপর নেমে এসেছে ! হঠাৎ সে বললে

—অমনি আমারও হয় মীলা, আমারও অমনি হয়! শুধু জহর কেন, পেয়ে যাদের হারিয়েছি, তাদের কথা মনে পড়লেই কেমন চোখে জল এসে পড়ে! আমার সেই কালো কোকিলটা! তার কথা মনে হলে আজও—

প্রমীলা তাকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে একধারে গিয়ে বসে রইলো।

ছাগলটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বাসুদেব বললে—জহরকে তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে—না? দেখেছি, দিন-রাত সে ভিন্ন তোমার মুখে আর অন্য কথাই নেই!

সুমুখের বেলগাছটার দিকে চেয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে প্রমীলা বললে—আসবো বলে গেছে, আসেও না, চিঠিও দেয় না—আমি থাকি কি করে' বলো তো—এমন একা-একা? ফাঁকা-ফাঁকা লাগে না?

বাসুদেব অতশত বোঝে না! মেয়েদের মত ভারি নরম তার মন। সে বললে—সত্যিই ত! হতভাগা মনে করে, পৃথিবীতে কেউ তার পথের দিকে চেয়ে নেই! একজনের জন্যে যে আর একজনের কতখানি আট্‌কায়, এ-কথা সে বুঝবে কেমন করে'? হাজার হোক ছেলেমানুষ

ত!—হেসে আবার বললে—তুমি জানো প্রমীলা—আমি মুখ্যু লোক, তাই বারবার মনে হয়, লেখাপড়া শিখলেই সকলের জ্ঞান হয় না।

প্রমীলা উঠে যায়—কিছু ভালো লাগে না। সমস্ত বাড়ীখানার সকল স্থানে পায়চারি করে' বেড়ায়। পরে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাসুদেবকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে —আমি কি কিছু চেয়েছিলাম তার কাছে? না, তাকে এতটুকু গ্রাহ্যই করি? শুধু তাকে এক একবার দেখতে চাই। সে যেখানে খুশী, সেখানে যাক, যা ইচ্ছা তাই করুক গে, কিন্তু একবার করে দেখা দিয়ে যেতে তার কি ক্ষতি?

ঘাড় ফিরিয়ে বাসুদেব ধীরে ধীরে বললে—আমিও এই কথা ভাবছিলাম মীলা, যাকে দেখতে ইচ্ছে করে, তাকে শুধু একবার দেখবো! নৈলে জোর আসে না যে! ঠিক বলেছো তুমি, যাকে দেখতে চাই অথচ পাইনে, তার জন্য সমস্ত মনটা অনাহারে মরে যায়। কেন এমন হয়, বলতে পারো? দেখেছো—একটা না একটার জন্যে আমরা সকলেই কাঙাল! আমি ঠিক জানি, প্রমীলা, জীবনে তোমারও সুখ নেই, আমারও সুখ নেই! জহরকেও জানি, সুখ ছাড়া জীবনে আর সবই সে পেয়েছে!

প্রমীলার চোখে আবার জল আসে। অকারণের অশ্রুজল!

রাতের বেলা চুপটি করে সে বসে থাকে। অনেক কথা ভাবে। জানালার বাইরে নিস্তব্ধ অন্ধকার থম্‌থম্ করে। কালো আকাশে অনেকগুলো তারা দেখা যায়। অতি সন্তর্পণে জহরের কথা ভাবে। যে কথাগুলো মনে করতে লজ্জা আসে, সে কথাগুলো ভাবে না। কিন্তু বন্ধুকে এড়িয়ে বন্ধুত্বকে চাইতে কি রকম যেন গোলমাল হয়ে যায়!

প্রমীলা তখন কাগজ-কলম নিয়ে বসে! অনেকগুলো কথা এক সঙ্গে লিখে ফেলবার জন্য একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে বুকের মধ্যে বালিশটা টেনে নিয়ে সে ভাবে, ঠিক কি কথা লেখা যায়? চিঠিখানা এমন করে লেখা চাই যে নিজের মনের সকল কথাগুলিই বলা হয়—অথচ জহর কিছু বুঝতে না পারে যেন।

কিন্তু কিই বা এমন কথা! এতদিন ধরে বারবার শুধু সে ভেবেছে, জহরকে চিঠি লিখতে হবে। কিন্তু লেখবার ত কিছুই নেই! মুখের কথা যেখানে থামে, সেইখানেই হয়তো মনের কথা সুরু হয়।

কাগজে খানিকটা হিজিবিজি কাটে। তার তলাতেই চিঠি লেখে। দুলাইন লেখবার পরেই চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

আরো কয়েক ছত্র লিখে ঘুম আসে। বিরক্ত হয়ে বলে—এই ঘুমের জ্বালায় কিছু হবার যো নেই, ছাই! সন্ধ্যে না হতেই পোড়া চোখে—

অসমাপ্ত পত্রখানির দিকে চেয়ে মনে মনে তার মন রাঙা হয়ে ওঠে। প্রকাশের আবেগটা ঠিক নেশার মত—ভাবতেই কেবল ভালো লাগে।

বাসুদেব যখন ঘরে আসে—তখন অনেক রাত। সে দেখে, প্রমীলা আলোটা মাথার কাছে রেখে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। মাথার কালো কালো চুলগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তার এই নিশ্চিন্ত নিদ্রার মধ্যে উদ্বেগ অশান্তির রেখামাত্র নেই!

রাতের বেলা বাসুদেবের এই একটা কাজ। প্রতি দিনই স্ত্রীকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে হয়। সারাদিন ছুটোছুটি করে একবার পড়লে মেয়েটির আর যেন জ্ঞানই থাকে না!

বিছানায় তাকে টেনে শুইয়ে দিয়েই বাসুদেবের চোখ

পড়লো চিঠিখানার ওপর। এমন চিঠি বহুদিন তার চোখে পড়েছে। কতগুলো অসম্পূর্ণ চিঠি যে এখানে-ওখানে উড়ে বেড়ায়, তার আর ইয়ত্তা নেই!

হাসতে হাসতে বাসুদেব চিঠিখানা তুলে নিয়ে পড়ে। প্রথমেই অসংখ্য বানান ভুল নজরে পড়ে, তার ওপর ব্যাকরণ প্রমাদ। বাসুদেব কলম হাতে করে সেগুলো শুধরে দেয়। এক জায়গায় একটা কথা প্রয়োগ করতে গিয়ে আর একটা কথা বসে গেছে! চুপি চুপি সে বলে—তা হোক, ছেলেমানুষ—রাত জেগে কষ্ট করে যে লিখেছে, এই ঢের!

হয়তো সত্যিই তাই। এ যেন হাতের লেখা চিঠি নয়,—মনের কথা যেন ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে! তাতে কাঁটা আছে হয়তো, কিন্তু সুগন্ধ তার যাবে কোথায়? চিঠির সবটুকুই সে পড়ে।

"ভাই জহর, দিন-রাত কেবল তোমারই দিকে চেয়ে আছি। তুমি আজো এলে না, কিন্তু মনের মধ্যে তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পাই! তুমি কাছেও নেই, দূরেও নেই—আমার মধ্যে তুমি আছো। তাই সকল সময়

নিজের দিকে চাইতে গেলেই তোমাকে দেখতে পাই।···তোমাকে যতক্ষণ ভুলে থাকি, ততক্ষণই আমার সুখ শান্তি, ততক্ষণ আমার সংসারের সকল কাজকর্ম্ম, সকল ভালোমন্দ—সব দিকে নজর দিতে পারি। তোমার কথা মনে পড়লে এত বড় আকাশটাও আমার কাছে খাঁচার মত মনে হয়, তখন আমি ইত্যাদি······”

তারপরে লেখা—

“আমাকে দেখা না দিয়ে তুমি যে এখনও থাকতে পার্‌ছো, তার কারণ বেশ বুঝতে পাচ্ছি। তোমাকে আমি জানি। ছি ছি, মেয়েদের পেছনে এমনি কতকাল ঘুরবে? কবে তোমার এ প্রবৃত্তি যাবে? কি চাও তুমি তাদের কাছে? যদি তাই হয়, আমার তাতে হিংসেও নেই, রাগও নেই। কেননা আমাকেও তুমি জানো!

আবার কবে দেখা পাবো ভাই? আমার কি ইচ্ছে করে, জানো? ইচ্ছে হয়, তোমার

দেহের ভেতর থেকে প্রাণটা ছিঁড়ে নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে থাকি! তোমার ওপর যে আমার এতটুকুও শ্রদ্ধা নেই, ভালোবাসা নেই, এটা তারি প্রমাণ।

তোমারই প্রমীলা।"

শেষ-পর্যন্ত পড়ে বাসুদেব কিছু বুঝতেই পারে না! আগাগোড়া যেন ধোঁয়া! এতখানি লেখার মধ্যে কোনো বক্তব্যের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। অথচ লেখার মধ্যে যেন তরুণ প্রাণের প্রচণ্ড বেগের একটা আভাস আছে!

আলোটা তেমনি জ্বলতে লাগলো। চিঠিখানি যত্ন করে মুড়ে আবার সেইখানে রেখে বাসুদেব জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো।

পূব আকাশে কৃষ্ণ-পক্ষের একটুখানি চাঁদ উঠেছে। তারই তলায় সুদূর থেকে সুদূর অবধি অন্ধকারের এক আশ্চর্য্য প্রতিরূপ! আলো আছে অথচ কিছু দেখা যায় না! এই ঘর-বাড়ী, গাছপালা, মানুষের বসতি, অদূরবর্ত্তী নদীর চরভূমি,—সমস্তটাই যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর একটা কোন পরিকল্পনার মধ্যে এসে পড়েছে! হঠাৎ

বাসুদেবের মনে হলো, সে বড় একা। নিকটে দূরে অতীতে বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে কোথাও তার কোনো সম্বলই নেই! বাঁধন যা ছিল,—আশ্রয় যা ছিল—সব যেন কোন্ এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে শিথিল হয়ে ঝরে গেল!

চন্দ্রালোকটুকু ওদিকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। সূর্য্যালোকের মত এ আলো সকল বস্তুকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেখায় না! চাঁদের এ আলো বরং সকল কুৎসিত, অসুন্দর ও বিকৃত বস্তুকে মনোহর করে' তোলে।

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে বিছানার একটা ধারে পড়েছিল! নিদ্রিত প্রমীলার রূপ সে আলোয় যেন বদল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, আকাশ থেকে আকাশে এই চন্দ্রালোকের সমারোহ, এ যেন আজ শুধু তারই জন্যে!

বাসুদেব হেসে বললে—এত রূপ যার,—সে কখনও পাগল হয় নাকি! যাবে এ সব ছেলেমানুষী একদিন ভালো হয়ে।—বলে অতি-সন্তর্পণে বিছানায় উঠে সে শুয়ে পড়লো। যেন প্রমীলার ঘুম না ভাঙ্গে!

হাজার হোক, তবু মানুষের মন! ভাঙা-গড়া আছেই। কোথায় যেন একটা খট্‌কা লাগে।

ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে সে ভাবে—অনেক কথাই ভাবে! প্রমীলার মনে যেন শান্তি নেই! দেখে ত, কেমন যেন ও অস্থির! কেন? আমার জন্যে? প্রমীলা কি ভাবে—প্রমীলাকে আমি ভালোবাসি না? না, না—ভালো সে বাসে—খুব ভালো বাসে—প্রমীলা মনে মনে তা জানে। প্রমীলা একবার তার মাসির বাড়ী গিয়ে চারদিন ছিল—বাসুদেব থাকতে পারেনি তাকে ছেড়ে। দুদিনের দিন বাসুদেব সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তবে?

বাসুদেবকে প্রমীলা ভালোবাসে না?

পাগল! খুব ভালোবাসে। বাসুদেবের জন্য কি না করে প্রমীলা? বাসুদেব যাতে সুখী হয়—সুখে থাকে—বাসুদেবের যা ভালো লাগে, প্রমীলা করে। তবে? না, না, প্রমীলা ঠিক আছে।

প্রমীলার মনে শান্তি নেই, এ-কথা ভাবতেও বাসুদেবের কষ্ট হয়! মনে মনে খানিকক্ষণ সে চিঠিগুলোর আলোচনা করে।

তারপর আবার ভুলেও যায়। পোষা পশুপক্ষীগুলির দিকে চেয়ে অনেক কথা ভাবে। এরা তার অনেক দিনের সঙ্গী। চন্দনা পাখীটা আজকাল পড়তে শিখেছে, ওর জন্যে

একটি ভালো পিতলের খাঁচা কিন্‌তে হবে ; পুষিটা অধুনা ভারি অবাধ্য হয়েছে—পাশের বাড়ীর রান্নাঘরে সম্প্রতি তার যাতায়াত যেন একটু বেড়েছে মনে হয়। আর ওই বাবুলাল! গলায় যদি ওর দড়ি বাঁধা না থাকে ত কোনদিন কেষ্টকলি আর বেলফুলের চারা দুটি সাফ করে দেবে! ছোট্ট মুখখানি বাড়িয়ে সংসারের সকল খাদ্য আর অখাদ্য বস্তুগুলি একবার চিবিয়ে দেখতে চায়!

বাসুদেব বলে—এবারে শীতকালে বাবুলালের জন্যে একটা গায়ের কাপড় করে দেবো—কেমন প্রমীলা? তোমারও গায়ের লেপ নেই তো!

প্রমীলা একটু হেসে বলে—ছাগলের সঙ্গে আমার নাম করতে লজ্জা হয় না তোমার?

না, না, তা বলিনি—বুঝলে? বলছিলাম যে—

প্রমীলা বলে—ছাগলকে অত আদর দিলে কোন্ দিন দেখবে, রান্না করে' তোমারই পাতে ঢেলে দিয়েছি।

বাসুদেব চম্‌কে ওঠে! বলে—তা কি পারো? মেয়েমানুষ হয়ে—তা কখনই—ধ্যেৎ!

প্রমীলা বলে—পারি আমি সব, তা বলছি। করি না শুধু লোকে কি বলবে, তাই জন্যে! আমি কাউকে ভয় করিনে।

বাসুদেব তার উন্মুখ এবং উদ্দীপ্ত যৌবনের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে। সত্যিই তাই মনে হয়! মনে হয়, এ মেয়েটির কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই! মেয়েটির যেমন রূপ, তেমনি নিটোল স্বাস্থ্য, গায়ের শক্তিও তেমনি অসীম। কোন কাজ করতে ভয় করে না—তাতে যত বড় পরিশ্রমই হোক,—কোন কথা বলতে বাধে না। কৃত কর্ম্মের কোনো ভয়ানক পরিণতির দিকে চেয়েও এতটুকু ভয় পায় না!

এ-কথা মিথ্যা নয়—এক এক জাতের মানুষ আছে, তারা চিরদিন ছোট থেকে যায়—তাদের জ্ঞান আর কোনো দিন হয় না। তারা বড় হয়, ঘর করে কিন্তু হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। মনের মধ্যে সর্ব্বদাই তাদের উত্তেজনা, কোনো একটা বস্তু অবলম্বন করে সংলগ্ন চিন্তা, ঠোঁটের ওপর দাঁত চেপে সংসারের সকল ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ঘোষণা,—এদের জীবনের কোনো ঐক্য নেই! প্রমীলা এই জাতের মেয়ে!

নিশ্বাস ফেলে বাসুদেব অন্যত্র গিয়ে বসে। প্রমীলা তখন এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে হাসতে থাকে।

হঠাৎ এক সময় বাসুদেব বলে ওঠে—দেখো মীলা,

দেখো, বাবুলালের লেজ নেই, তবু নাড়ছে, দেখো। আর গঙ্গারাম, তুমি কি দেখছো? খাঁচার ভেতর থেকে বাবুলালের দিকে ঘুরে ফিরে তাকাচ্ছো, ওকে বুঝি তোমার পছন্দ হয়? তা পুষি আমাদের যদি ঘট্‌কালিটা করে, আমি রাজি আছি।

প্রমীলা হাসি বন্ধ করে' নিশ্বাস ফেলে চলে যায়।

দিন দিন যেন একটা ব্যবধান বেড়ে ওঠে দুজনের মধ্যে—কাছে থেকে দুজনেই যেন দূরে সরে' যায়।

……তবু চিঠি সেদিন এলো। খামে ভরা একখানি চিঠি। বাসুদেব হাতে করে এনে বললে—বাস্, আর কি! জহরের চিঠি।—বাঁচলাম!

প্রমীলা ঝাঁপিয়ে পড়ে চিঠিখানা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে।

বাসুদেব বললে—সত্যি বাঁচলাম মীলা। তোমার দিকে চেয়ে আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম!—বলে সে সোৎসাহে এবং সানন্দে আবার নিজের কাজে লেগে গেল।

কোনো কথা শোনবার অবসর তখন প্রমীলার নেই।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে কোথায় বসে পড়বে, এই কথা ভাবতে ভাবতে খানিকক্ষণ সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

ঘরের মধ্যে গেল। কিন্তু এ চিঠি বোধ করি ঘরের ভেতর বসে পড়বার নয়! শেষকালে খোলা ছাদের ওপর গিয়ে এক জায়গায় বসে পড়তে লাগলো। চিঠিখানি বড় কিন্তু অক্ষরগুলি যেমন ছোট ছোট, তেমনি স্পষ্ট।

প্রমীলা বললে—তা হোক। এমন হাতের লেখা হলে কত লোকে,—ঢের দেখেছি।

বিষ যেমন রক্তের সঙ্গে মিশে সারা দেহ ক্রমে অবশ করে ফেলে, প্রমীলারও সমস্ত দেহের চেতনা ঠিক তেমনি একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে সেই চিঠি শুনতে লাগলো—সাপ যেমন বাঁশীর তান শোনে!

"ভাই প্রমীলা,

তোমার চিঠি পেয়ে ভাবচি এতদিনের কথাগুলো কি রকম ভাবে তোমায় বলি। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার নাকি একটা বাড়াবাড়ি আছে—শত্রুপক্ষ এই কথা বলে। আমার অপরাধ, তারা যে মেয়ে এইটি তাদের ভালো করে চিনিয়ে দিই। ধরো তোমার কথা। তুমি যে তুমিই, তোমার রূপ

যৌবন, মাধুর্য্য নিয়েই যে তুমি—এই কথাই আমি শিখতে চাই। এ হেঁয়ালি নয়, নারীকে যখন দেখবো ঠিক, তখন উর্ব্বশী করেই তাকে দেখবো। অন্য কোনো রূপে দেখা মানেই পাপ। কিন্তু এই পাপীর সংখ্যাই সংসারে বেশী।

······নারীকে দেখে যেন বলতে পারি, তুমি আমার!

চিঠি লিখতে লিখতে আজ শুধু তোমারই দিকে আমার সমস্ত চোখের দৃষ্টি মেলে আছি। ভাবচি, তোমার ওপর আমার প্রেমও নেই, কামও নেই, কিন্তু যে আকর্ষণ আছে, সেটা কি অপূর্ব্ব! দুজনকে জানবার জন্য দুজনের কি অধীর আগ্রহ। আমিও যেমন, তুমিও তেমনি অতল, অপরিসীম, বিপুল! আমার চোখের সুমুখে তুমি যেন একটা বিরাট অচেনা। কি রকম চেয়ে থাকা, জানো? পৃথিবী যেমন মঙ্গল গ্রহের দিকে চায়, সমুদ্র যেমন আকাশের দিকে চেয়ে থাকে! তোমার দিকে চেয়ে কূল-কিনারা পাইনে, তুমি যে কোথায় আছো, কোন পুরীর মধ্যে বন্দিনী—সে পুরীর তোরণ-দ্বার কে কবে খুলবে—কবে তখন তোমাকে দেখবো—বলতে পারো?

দিন কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভেতরের সেই সন্ন্যাসীটা আমার এই জীবন-যাত্রায় প্রতিবাদ করে ওঠে।

আমার পাপের ভারে তার মাথা দিন-রাত হেঁট হয়ে থাকে। কিন্তু কি করবো—দেহের ফাঁদে আমি বন্দী! কবে আবার নির্ম্মল নিষ্পাপ হয়ে এই আকাশের আলোয় আবার ফিরে আসবো! আমার মনে হয়, জীবনের'পর জীবন ধরে আমার মত সকলেই এই প্রার্থনা করেছে—অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও বলে।”

এমনি কতকগুলি কথাতেই চিঠি শেষ হয়েছে। হাতের মধ্যে সেখানা চেপে ধরে প্রমীলা খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে বসে' রইলো।

কিন্তু জহর যা বলে, তা মিথ্যে নয়! প্রমীলা শুধু তাই ভাবে!

জহরের সঙ্গে তার মতের কোথাও অমিল নেই। এগুলি যেন তারই কথা!

উঠে নীচে এসে প্রমীলা কি যে করবে, ভেবে পায় না।

বাসুদেব এই দিকে আসতে আসতে হঠাৎ তাকে দেখে বলে—ওঃ, তুমি এখানে! আমি মনে করি—। বলতে বলতে সে আবার ফিরে যায়।

অনেক বেলায় রান্নাবান্না চড়ে।

খেতে দিয়ে কাছে বসে প্রমীলা বলে—চিঠি এলো, কই, তুমি শুনতে চাইলে না ত!

তা কি হয়?—বাসুদেব বলে—পরের চিঠি পড়লে সাড়ে চুয়াত্তরের,—এ কথা মিথ্যে নয়।

আমি পর নাকি?

এই বাঁকা প্রশ্নগুলিকে বাসুদেবের বড় ভয়! কোন্ উত্তরটা দিলে সব দিক ঠিক বজায় থাকে—সে শুধু তাই ভাবে—কিন্তু ভেবে আর থৈ পায় না!

তাড়াতাড়ি সে খেতে সুরু করে দেয়।

প্রমীলা একটু উস্‌খুস্ করে পরে বলে—তুমি যাই বলো, আমি বেশ জানি, জহর যে আমায় চিঠি লেখে, আমার খবর নেয়, তার মনের কথা সব বলে, তোমার এ কিছুতেই ভালো লাগে না!

মুখ তুলে বাসুদেব বলে—কেন?

কেন! কেন—তা কি ভেঙে বলতে হবে? কোনো স্বামীর কি এ সহ্য হয়?

বাসুদেব নিশ্বাস ফেলতে ফেলতেই হাসে; হেসে বলে—হয়!

প্রমীলা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

আজ যেন বাসুদেবের মুখ ফোটে! বলে—তুমি ত আমার সম্পত্তি নও! তোমাকে পাবার জন্য ত আটকে রাখবার দরকার হয় না! তোমার জন্যে কাঁদতে পারি কিন্তু তোমায় বাঁধতে পারিনে মীলা। কোন মানুষকে কোন মানুষ বেঁধে একেবারে নিজের করে রাখতে পারে না! না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে, না ভাইবোন!···তুমি নিজে থেকে পেতে দিলে তবেই তোমাকে পাবো—নাহলে ভয় দেখিয়ে শাসন করে গহনা-কাপড়ের লোভেও কি তোমাকে পেতে পারি? বলো?

মুখ ভার করে প্রমীলা বলে—তার মানে, আমি কোথাও চলে গেলে তুমি দিব্যি থাকতে পারো—এই ত?

বলতে বলতে সে উঠে চলে যায়।

রাতের বেলা কি জানি কেন, অকারণে বারবার প্রমীলার চোখে জল আসছিল।

তৃপ্তি নেই! আনন্দও বুঝি শুকোলো!

জীবনের শিকড় থেকে আগাগোড়া পাতাটি পর্য্যন্ত যেন বেদনায় রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে!

অন্ধকারে প্রমীলা এদিক ওদিক তাকায়!······শিরায় শিরায় জহরের চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষর যেন চলাচল করে!

মিটমিটে আলোটা জ্বলার চেয়ে না জ্বলাই ভালো—চক্ষুকে পীড়া দেয়।

প্রমীলা উঠে বাইরে এলো। অনন্ত আঁধিয়ার মধ্যে অকস্মাৎ তার মনে হলো, সে যেন নিতান্তই একাকিনী! অবলম্বন করবার মত একটি সতেজ বৃক্ষও নেই!......

একাকিনী!

প্রাণ-বায়ুটা যেন কণ্ঠের কাছে এসে তার টুঁটি টিপে ধরলে!

সেখান থেকে ফিরে এসে সিঁড়ির ধারেই ছোট ঘরটার কাছে দেখে, বাসুদেব তার পশুপক্ষীগুলির তদ্বিরে লেগে আছে।

প্রমীলা পিছন থেকে গিয়ে তার একটা হাত ধরে বললে—উঠে এসো।

বাসুদেব তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, ভয়ে যেন সে বেতস পত্রের মত কাঁপচে! বললে—কি? যাবো?—তা চল, যাচ্ছি।

দুজনে উঠে ঘরে এলো। বাসুদেবের পাশে বসে তার বুকের কাছে মাথা রেখে প্রমীলা বললে—দিন-দিন তুমি পর হয়ে যাচ্ছো কেন, বলো ত?

পাগ্‌লী কোথাকার!—বাসুদেব হেসে বললে—অমন কথা কি বলতে আছে?

প্রমীলার চোখে তখন জল টল্‌টল্ কচ্ছে। বললে—আমায় অমন এক্‌লা ছেড়ে দিও না। কি জানি, আমার কেমন—

বাসুদেব বললে—জহরকে তুমি চিঠি লিখছিলে, তাই জন্যেই ত আমি ওদিকে বসে ওদের—

চুলোয় যাক্ জহর! তার কথা আমি আর শুন্‌তে চাইনে।

তা কি হয় মীলা? সে আমার দূর-সম্পর্কের ভাই হয় বটে কিন্তু তার চেয়েও সে বড়,—সে আমার বন্ধু! ভাই হলে হয়ত ত্যাগ করা যেতো, কিন্তু বন্ধুকে—

প্রমীলা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে—তা হোক। আমাদের মাঝখানে সে যেন না আসে! তুমি—তুমি স্বামী! বিয়ে করে এনেছো—আমার ভার নেবে···আমাকে সুখী করবে! তুমি আমার সব! তুমি এ-সব পশুপাখী ছেড়ে দাও··· ওদের উপর এত দরদ, এত মায়া···আমার উপর একটু মায়া হয় না তোমার?

বলতে বলতে প্রমীলার দুচোখে জল আসে।

বাসুদেব অস্থির হয়ে ওঠে! আদর করে প্রমীলার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বাসুদেব বলে—কেঁদো না। কেন কাঁদছো? কে বললে, তোমার উপর আমার মায়া নেই? তুমি স্ত্রী—

অভিমানের বেদনায় প্রমীলা ঝঙ্কার তুললো—থাক্—থাক্! আমি স্ত্রী···স্ত্রীকে তুমি কি দিয়েছো? তার মুখের পানে কখনো চেয়েছো? কখনো ভেবেছো, কিসের জন্য সে হাহাকার করছে—কি সে চায়? না, না,—তুমি ভাবো, আমি একটা পুতুল—আমাকে নিয়ে ঘর সাজাবে! কখনো যদি অবসর হয়···খেয়াল হয়—আমাকে নিয়ে খেলা করবে! আমার যেন প্রাণ নেই···মন নেই—

আবেগের এমন উচ্ছ্বাস, এমন আতিশয্য বাসুদেব কখনো দেখেনি! আজ প্রমীলার এ মূর্ত্তি দেখে সে কেমন হতচকিত হলো। কি সে বলবে—কি যে করবে—

জীর্ণ স্যাঁতসেতে ঘরখানির মধ্যে রাতটা অতি-কষ্টে কাটে। দরজা থেকে দু-পা বেরিয়েই এর মধ্যে আবার একটা পানা ডোবা। রাজ্যের মশা আর আবর্জ্জনার আড্ডা।

পাড়ার লোকে সেই জল ব্যবহার করে আর ম্যালেরিয়ায় ভোগে।

ভোর বেলায় উঠে জানালার কাছে বসে জহর সেই-দিকে চেয়ে ছিল। মেয়েরা ডোবার ওপারে তখন বাসন মাজতে নেমেছে।

সন্তোষ ঘরে ঢুকলো। হাতে গরম এক পেয়ালা চা।

মুখ ফিরিয়ে হেসে জহর বললে—আপনার এতটুকু অনিয়ম হবার যো নেই, দেখছি। কিন্তু যে রকম যত্ন করতে আরম্ভ করেছেন, এতে লজ্জায় আমার অধোবদন হওয়া উচিত।

সন্তোষ হেসে বললে—ভুল করলেন! ডেলি প্যাসেঞ্জারদের যত্ন করবারও সময় নেই। পানাগড় থেকে আমাদের আফিসে একটি লোক চাকরী করতে আসেন—বুঝলেন? তার ছেলেমেয়েদের সাতদিন অন্তর পিতৃদর্শন ঘটে! এমন নৈলে আর চাকরী!

জহর বললে—তা আপনাকে দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। এর মধ্যে আপনার স্নানাহার ইস্তক পাণ চিবোনোটি পর্য্যন্ত—আচ্ছা, এ আপনার ভালো লাগে?

ভালো লাগে!—বাইরের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে

সন্তোষ বললে—আমার ভালো লাগে না বলে সংসার ত আমায় ছেড়ে দেবে না জহরবাবু! আজ চাকরী ছাড়লে শুধু ত আমি উপবাস করবো না, সঙ্গে বিধবা মা বোন—ওই বাঁশী বাজছে। নমস্কার!—বলতে বলতে উঠে একরকম দৌড়েই সে বার হয়ে গেল। পিছন ফিরে একবার শুধু বললে—চায়ের যোগাড় ঠিকই আছে, কিছু ভাববেন না।

ইষ্টিশানের পথের দিকে সে ছুটতে লাগলো।

সকাল বেলাকার আলো আজ যেন চারিদিকে আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। অদূরে মুন্সীদের বাগানে নারিকেল বনের মাথায় লাল রোদ উঠেছে। দিবালোকের ভূমিকাটিতে কোনো চাঞ্চল্যের আভাস নেই! এমন দিন অলস ভাবে কাটাতেই সব চেয়ে ভালো লাগে।

চায়ের বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে হেসে জহর আপন মনেই বললে—কিন্তু চাকরীর ওপর আমার ভারি মমতা!

চায়ের বাটিটা আবার নামিয়ে রেখে বিছানার তলা থেকে সে একখানি চিঠি বার করলে। সদ্য-আগত চিঠি নয়—বরং তিন-চারদিন আগেকার। কিন্তু এই তিন

চারদিন ধরে পড়ে পড়েও সেই অপূর্ব্ব পত্রখানি আজও তার শেষ হয়নি। পত্রখানি রাগিণী দেবীর লেখা। যাবে নলিনীরঞ্জনের কাছে—কিন্তু যেতে যেতে ডাকঘরের মারফৎ আটক পড়েছে।

অপূর্ব্ব রচনা! আগাগোড়া একেবারে অখণ্ড প্রতিভার ছাপ্‌মারা! যেমন প্রাঞ্জল ভাষা, তেমনি নির্ভুল ভাব প্রকাশ! জমিদারের মেয়েটি ভদ্র ভাষায় ব্যারিষ্টার বাবুটিকে যা লিখেছেন, তার ভাষা ভদ্র হলেও অন্তর্নিহিত অর্থ···বুঝতে পারলে শিউরে উঠতে হয়! কোনো ভদ্র-ঘরের কন্যা এমন ভাবে আত্মনিবেদন করতে পারে, এ তার ধারণার অতীত!

এই প্রণয়-নিবেদনের মধ্যে আভিজাত্য হয়ত রক্ষা হয়েছে কিন্তু এতে ভালোবাসার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। এ কামনার প্রদীপ নয় যে আলোক দান করবে! এ শুধু মরণের চিতা! জ্বলে উঠেছে শুধু ছাই হবার জন্যেই!

জহর ভাবতে লাগলো, কি দরিদ্র এরা! এদের যৌবন আছে, রূপও হয়ত আছে কিন্তু ভালোবাসার শক্তিটা একেবারে পঙ্গু!

বেলা হয়ে যাচ্ছে। গা ঝাড়া দিয়ে জহর উঠে

দাঁড়ালো। চিঠিখানা মুড়ে জামার পকেটে রেখে বাইরে এলো।

স্নানের জল প্রতিদিনের মত আজও ধরা ছিল। সাবান গামছা তেল সবই প্রস্তুত। কোন্ একখানি অদৃশ্য নিপুণ হাত যে এগুলি প্রত্যহ গুছিয়ে রাখে, তার সন্ধান নেই।

স্নান সেরে জামা-কাপড় পরে দরজা বন্ধ করে যখন সে বেরোলো, তখন সত্যিই বেলা হয়ে গেছে।

হোটেলে খেয়ে যখন ডাকঘরে এসে পৌঁছুলো, দশটা বাজতে তখন আর বিলম্ব নেই!

মাস্টার মশাই তখন কাজে ব্যস্ত। চশমার ওপর দিয়ে চোখ তুলে বললেন—কিহে, বিয়ে হলে পুত্র-কন্যে—তুমি যে দেখছি প্রবল বন্যার মতই এলে! এত দেরী যে?

আজ্ঞে এই—

সুরেশচন্দ্র বললে—বাই চান্স দেরী হয়ে গেছে আর কি!

ওই দেখ, সুরেশচন্দর সব ছাড়তে পারে, শুধু দুটি জিনিষ পারে না। একটি হচ্ছে চাকরি আর একটি চান্স।

জহর এদিক ওদিক চেয়ে হেসে বললে—জগন্নাথ বাবু গেলেন কোথায়?

তার এই মৃদু হাসি আর বলবার ভঙ্গী দেখে সুরেশ কঠিন দৃষ্টিতে একবার চেয়ে চুপ করে রইলো।

বুড়ো বললে—জগন্নাথের অবস্থা জগন্নাথেরই মত। ডান হাতটি হাসপাতালে গেছে, তিনি আর কোন্ মুখে আপিস করবেন! হাতের ফোড়া নিয়ে বেচারা ভারি কষ্ট পাচ্ছে।

আপনারও যে জ্বর হয়েছিল?

এমন জ্বরে আর কাবু নই হে—বুঝলে? তোমাদের মতন ছেলে-মেয়ে নিয়ে জরজর হয়েই আছি।

নিজের কথায় বুড়ো নিজেই হাসতে থাকে।

সেটা শনিবারই ছিল বটে। সকাল সকাল কাজ সেরে সুরেশ চলে গেছে! কাজটুকুর সঙ্গেই তার সম্পর্ক। কাজ হয়ে গেলে সে আর কারো নয়। নিজেকে নিয়েই সে থাকে। শম্ভু বিনা-বেতনে চাকরী করে সুতরাং সে আগেই চলে যায়। শেষ ডাক না এলে জহরের যাবার উপায় নেই।

পিয়নটার কোন কাজকর্ম্ম ছিল না—দোরের গোড়ায় বসে ঝিমুচ্ছিল।

মাষ্টার মশাই মুখ তুলে বললেন—ও আমাদের ঘরের ছেলেই হয়ে গেছে। একটু কম লজ্জা করলেও চলবে!

চিঠি বাছতে বাছতে মুখ ফিরিয়ে জহর দেখলে, পর্দ্দার পাশে বিজয়া ওষুধের গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো আবার বললে—কি বলো হে, তুমি কি এতই লজ্জার পাত্র?

জহর বললে—আমি মুখ ফিরিয়েই আছি। কারো দিকে মুখ তুলে চাইবার আমার সময়ই নেই, মাষ্টার মশাই।

বিজয়া চোখ পাকিয়ে নিজেই রাগের হাসি হাসলে।

বুড়ো ফিরে ফিরে দুজনের দিকে তাকায়···কি যেন একটা ভাবে।

বিজয়া ধীরে ধীরে এসে ওষুধের গেলাসটা বাপের টেবিলের ওপর রেখে মুখ রাঙা করে চলে যায়।

অখণ্ড মনোযোগে জহর তখন চিঠি দেখছে। মনোযোগটা ঠিক সন্ন্যাসী ধরণের। অর্থাৎ ফিরে তাকালেই বুঝি ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হবে—এমনি ভাবখানা!

বুড়ো ঢক্ করে ওষুধটা গিলে মুখখানা একবার বিকৃত করে; পরে তখনই হেসে হঠাৎ বলে—মন্দ নয়!

জহর বলে—রুগী বুঝি ওষুধের প্রশংসা করে?

ফিক্‌-ফিক্‌ হেসে বুড়ো বলে—ওষুধের প্রশংসা! তাই হবে!—পরে ফোঁস করে একটি নিশ্বাস ফেলে বলে—বিয়ে হলে পুত্র-কন্যে, আসে যেন—ওরে বিজয়া, আর এক দাগ ওষুধ আমায় দে মা।

বলতে বলতে বুড়ো উঠে পর্দা সরিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢোকে। পরে ভেতর থেকে দরজাটা একটু ভেজিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কোন্‌ একটি শ্রোতার উদ্দেশে বলে—লজ্জা! এত লজ্জা কেন, শুনি? দু মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পা ব্যথা করে বুঝি? বাঘ, না, ভালুক?

ঠিক এমনি সময় একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক বারান্দার কাছে এসে এদিক ওদিক চেয়ে বললে—কে আছো গা বাবুরা?

কেন? জহর বললে।

চিঠি-পত্তর কিছু আছে? এসো না এদিকে বাবু একবার!

কার চিঠি চাও?

সে বললে—রাগিণী দেবীর নামের চিঠি, বাবা। ওই যে এসেছেন উনি আমার সঙ্গেই—গাড়ীর মধ্যে। এসো বাবু—একবার এসো।

সমস্ত মনটা অকস্মাৎ যেন একবার কাঁটা হয়ে উঠ্‌লো !

জহর বললে—চলো, যাচ্ছি।

আনন্দের চেয়ে ভয়টাই বোধ করি একটু বেশি ছিল। বাইরে বেরিয়ে গাড়ীর কাছে আসতেই ঝিয়ের ডাক শুনে সে যার দিকে ফিরে তাকালো, তার দিকে চেয়ে—

এই রাগিণী দেবী ! এত রূপ মানবীর !

রাগিণী তাকে নমস্কার জানিয়ে বললে—দেখে মনে হচ্ছে, আপনারই নাম জহরবাবু ! এইখানেই চাকরি করেন ?

সমস্তটাই যেন ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছিল ! আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে জহর বললে—হ্যাঁ, আপাতত এইখানেই—

তা বেশ। চাকরির বাজার শুনেছি ভারি মাগ্যি। মাইনে পান কত ?

পঁচিশ।

পঁচিশ টাকা ?—তা সে যাই হোক, পঁচিশ টাকাই বা কোত্থেকে আসে !—বলে রাগিণী তার সেই লাল মখ্‌মলের ওপর জরির বুটি-কাটা নাগরা জুতোটা গাড়ীর গদির ওপর ঘষতে লাগলো।

এক-একজনের রূপ আছে, যার দিকে তাকালে কণ্ঠে স্বর পর্য্যন্ত ফোটে না !

জহর বললে—আমার নাম জানলেন কি করে?

তাচ্ছিল্য কণ্ঠে রাগিণী বললে—আপনার নামের যে ছড়াছড়ি এখন গলায়-গলায়! বন্ধুত্ব, না, আরো কিছু! দাদার ও-সব ন্যাকামি!

জহর বললে—মোহিত আপনার দাদা হয়?

মুখে একটা শব্দ করে রাগিণী বললে—দাদার চেয়ে ছোট ভাই হওয়াই তাঁর উচিত ছিল। তা যাক সে কথা। ডাকঘরে আপনি কাজ করেন শুনে ভাবলাম চিঠিপত্রের খোঁজ-খবর একটু-আধটু বোধ হয় রাখেন! পিয়ন-টিয়নের কাজ বোধ হয় আপনাকে করতে হয় না?

তার সেই প্রদীপ্ত শিখার মত মুখখানার দিকে চেয়ে জহর বললে—তা বিশেষ করতে হয় না, তবে হলেই ভালো হতো।

তার মানে?

তা হলে বোধহয় মেয়েদের অবজ্ঞার পাত্র হতাম না! শুনেছি মেয়েরা ডাক-পিয়নদের একটু শ্রদ্ধাই করে!

শ্রদ্ধা!—ঠোঁট উল্‌টে রাগিণী বললে—কিছু কিছু বখ্‌শিস্ দেবার নাম শ্রদ্ধা?

হঠাৎ হেসে জহর বললে—কিন্তু এমন ডাক-পিয়ন ত

থাকতে পারে যারা আর্থিক বখ্‌শিস্‌ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না!

রাগিণী চম্‌কে উঠে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনি কথা কইতে জানেন কিন্তু কথা বলবার দায়িত্ব-জ্ঞান আপনার নেই। আমি কে আর কোথা থেকে এসেছি, ভুলবেন না যেন!

বিবর্ণ মুখে জহর তার দিকে চেয়ে রইলো। রাগিণী বললে—না, না, আমি কিছু মনে করিনি, এসব শোনা আমার অভ্যেস আছে! আপনি ছেলেমানুষ, একটা কথা বলে ফেলেছেন, তা বলে কি আর,—আমার নামে চিঠিপত্র কিছু আছে, জানেন কি? বোধ হয় নেই—না?

দাঁড়ান্‌ দেখছি—বলে জহর ফিরে ডাকঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

ভেতরে এসে কয়েক মুহূর্ত্ত সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। অপমানে, আঘাতে, লজ্জায় মুখখানা তখন তার লাল হয়ে উঠেছে।

এর কি কোনো প্রতিশোধ নেই?

না যদি থাকে ত এতদিনকার এই মিথ্যা অভিনয় এইখানেই শেষ হয়ে যাক্‌!

আছে। প্রতিশোধ একটা আছে বৈ কি!

জহর তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একখানা সদ্য-লেখা চিঠি বার করলে। চিঠিখানি যেখানে শেষ হয়েছে, তার তলায় নাম সই করলে—নলিনীরঞ্জন। পরে চারটি পয়সা টেবিলের ওপর রেখে সাদা একখানি খাম নিয়ে ফস্‌ফস্‌ করে একটা ঠিকানা লিখে চিঠিখানা তার মধ্যে পুরে সেটা আঠা দিয়ে জুড়ে দিলে। তারিখের মোহরটা কাছেই ছিল, এদিক-ওদিক একবার চেয়ে তার ওপর একটা ছাপ মুদ্রিত করে দিলে।

গাড়ীর মধ্যে বসে উন্মুখ আগ্রহে রাগিণী তার পথের দিকে চেয়ে ছিল। জহর এসে বললে—ছিল একখানা চিঠি আপনার নামে—এই নিন্‌।

পত্রখানি হাতে পেয়েই রাগিণীর সেই সুন্দর মুখ দেখতে দেখতে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বললে—যদি কিছু বলে থাকি, মার্জ্জনা করবেন। ডাক-পিয়ন হলে আজ সত্যিই আপনাকে বখ্‌শিস দিয়ে ফেলতাম!—বলে সে নিজেই মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো!

উপযুক্ত অবসর! জহর বললে—বেশ ত, দরকার হলে জোর করে বখ্‌শিস আদায় করে নেবো।

কোচম্যানকে গাড়ী চালাতে ইঙ্গিত করে রাগিণী হেসে বললে—তা হলে এইখানে দাঁড়িয়েই নেমন্তন্ন করে যাই। বেড়াতে বেড়াতে এক-আধদিন গেলে সকলেই খুশী হবো। নমস্কার!

নমস্কার!—জহর বললে—মোহিতকে বলে দেবেন, তার বায়নাকুলারটা নিয়ে শীগগিরই যাবো একদিন।

আচ্ছা।

গাড়ী চলতে লাগলো। পথে এসেই পত্রখানি পড়বার জন্যে গাড়ীর মধ্যে রাগিণী তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

জহর খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সেই পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। চারিদিকের এই স্পষ্ট দিবালোক, মানুষের কোলাহল, তার এই ডাকঘরের চাকরি,—এ সব ছাড়িয়ে কোথায় যে সে তলিয়ে গেল, তার আর ঠিকানা নেই! হঠাৎ তার মনে হলো, এ রূপের সত্যিই তুলনা নেই! মানুষের সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত কামনা দিয়ে এ যেন একদিন প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল!

এর তুলনা যেমন নেই, এর প্রয়োজনও ঠিক ততখানি

আছে! তার মনে হতে লাগলো, সৌন্দর্য্যের মত এত বড় অবলম্বন মানুষের বাঁচবার পক্ষে আর কিছু নেই! রূপ বস্তুটা সকল সময়েই দেহের সীমায় আবদ্ধ থাকে! অমন মুখ, অমন দুটি চোখ, পটে আঁকা ছবির মত অমনি মুখের একটা ধার,—আগুনের মত ঠিক অমনি গায়ের রং, ত্রস্ত উন্মুখ যৌবন,—এরা সমস্তই দেহকে আশ্রয় করে আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু যে-বস্তুটা দেহাতীত, সৌন্দর্য্যের যেটি সহজ প্রকাশ, পুষ্পগুচ্ছের মত যে-বস্তুটি অকারণে অহেতুক বিকশিত হয়ে উঠেছে,—সেখানে ভোগ আর উপভোগ দুটোই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আজকের আকাশ তাই জহরের চোখে অকস্মাৎ যেন গাঢ় নীল হয়ে উঠলো!

মনে হলো, চারিদিকের এই অবাধ শূন্যতা আড়াল করে এই অপরূপ রূপ পরিপূর্ণ স্বপ্নরাজ্যের ওপারে দৃষ্টি মেলে স্থির হয়ে আছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল কালো, বাইরের আলো পড়ে ঠিক যেন কাঁচের মত ঝক্‌ঝকে! ভুরু দুটি যেন তুলি দিয়ে আঁকা, মাথার চুলগুলি কোঁকড়ানো, কিন্তু ঠিক কালো নয়—অনেকটা গৈরিক রঙের। সূর্য্যাস্ত সময়ের মেঘের মত—একটু হাওয়া লাগলেই মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে

এসে পড়ে। উৎকৃষ্ট কাব্যের এক-একটি পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে লোকে যেমন অভিভূত হয়ে পড়ে, রাগিণীর সেই আশ্চর্য্য রূপের প্রতি অংশটির কথা ভাবতে ভাবতে জহরের তেমনি সর্ব্বাঙ্গ বারবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

এইটুকুর মধ্যেই এত বড় সংসারটা কখন যেন তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে! সে যেন সেই আদিম সৌন্দর্য্য-পূজারী সন্ন্যাসী!

বারবার শুধু তার এই কথাই মনে হতে লাগলো, এই সৌন্দর্য্যময়ী তরুণীটি সর্ব্বত্রই যেন নিজেকে বিস্তার করে ছেয়ে আছে! অরণ্যানীর মত এর পরিপূর্ণ দেহ, আকাশের মত দৃষ্টি, ফুলের গন্ধের মত নিশ্বাস, সিন্ধুর তরঙ্গ-দোলার মত এর যৌবন, চন্দ্রালোকের মত এর সুষমা......

কামনার কল্পলোকে এ কোনো উর্ব্বশী নয়, অবাস্তব স্বর্গীয় কোনো মিথ্যা দেবী নয়,—এ সত্যই নারী!

পিছন দিকে বিজয়া এসে কখন যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল, জহর তা টের পায়নি। হঠাৎ সে বললে—আপনার নাম জহর, তবে নলিনীরঞ্জন বলে নাম সই করলেন যে?

জহর এতক্ষণ বুঝতেই পারেনি যে রাগিণীর নামে সে একখানা চিঠি লিখে ফেলেছে! কিন্তু গোপন করবার আর

সময়ও ছিল না। মুখ ফিরিয়ে বললে—এর মধ্যে পাশ থেকে চিঠিটা পড়ে নিয়েছ নাকি ?

হুঁ—পড়লামই বা !

পড়েই সুখ, কি বলো ? আচ্ছা, ওপরের নামটা যদি হতো বিজয়া আর নীচেরটা জহর, তা হলে ?

রাগ করে বিজয়া বললে—যান, আপনি ভারি ইয়ে !

হঠাৎ এক-মুখ হেসে জহর বললে—এই ইয়ে কথাটার ভেতর দিয়ে কত কথাই বলা যায়—না, বিজয়া ?

অত কথা বিজয়া বোঝে না। হেসে জহর বললে—সামান্য দু একটা জিনিষ ছাড়া সংসারে তোমরা আর কিছুই বুঝতে চাওনা ! কেমন ?

তা জানি না।—দেখি না, কি চিঠি লিখলেন, ভালো করে একবার পড়ে' নিই।

জহর তার মুখের ওপরেই ধীরে ধীরে রাগিণীর লেখা সেই পত্রখানি কুচিকুচি করে' ছিঁড়ে ফেললে। পরে আবার তেমনি হেসে বললে—আশ্চর্য্য, এই কৌতূহল-বৃত্তিটুকু ছাড়া তোমাদের কি আর কিছু নেই ?—একটা কথা বলবো বিজয়া ?

বিজয়া তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। জহরও তার

দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো—তোমরা সত্যিই এমনি! তোমার দিকে চেয়ে ভাবচি, দেহ ছাড়া আর কোনো মূলধনই তোমাদের নেই।

এই বুঝি আপনার বক্তৃতা আরম্ভ হলো ?

জহর অন্যদিকে চেয়ে বললে—তা সত্যি। এটা আমি ছাড়তে পারিনে! তোমাদের মতন রক্তমাংসের ঢিপিগুলোকে দেখলে এমনি বমি আমি মাঝে মাঝে করে' ফেলি। ছি ছি বিজয়া, তোমরা কি শুধু টানতেই পারো, বাঁধতে পারো না কোনোদিন ?

বিজয়া অনেক দিন ধরে এমনি একটা কথা শুনে আসছিল, কিন্তু আজ তার হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠলো! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে—আপনার সে বাহাদুরীর কথা ক'বার করে' বলবেন, শুনি ? সত্যি-মিথ্যে আপনিই জানেন, কিন্তু সেই সব মেয়েদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে এসেছেন, তাতে—

তাতে কি ?

লজ্জা হয় না আপনার ?

জহর বললে—যদি বলি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আছে ?

ও আপনার মিথ্যে কথা। লজ্জা আপনার এতটুকুও নেই।

ঢোঁক গিলে জহর বললে—হুঁ, বেশ! তারপর?

আঘাত পেয়ে পেয়ে বিজয়া উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। সে বলতে লাগলো—আপনার লজ্জাও নেই, ভয়ও নেই। পাপের ওপর টান্ আপনার এত বেশী যে সামান্য জন্তু-জানোয়ারেরও অত নয়!

এ মেয়েটির মুখে কোনোদিন কথা ফোটে না, কিন্তু আজ তার মুখের দিকে চেয়ে জহর খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইলো। মেয়েটার যৌবন ছাড়া রূপ যে কতটা আছে, তা ঠিক বলা যায় না! কিন্তু সত্যিই এর যেটুকু শ্রী আর মাধুর্য্য আছে—মনে হলো, আজকেই যেন তার প্রথম প্রকাশ! এমন করে' কথা কইলে, ভেতরের উত্তেজনায় অকস্মাৎ এমনি আরক্ত হয়ে উঠলেই যেন একে ঠিক বোঝা যায়!

বিজয়া বললে—চেয়ে আছেন যে? এ কি আমার মিথ্যে কথা?

জহর মাথা হেঁট করলো! এবং হেঁট মুখেই ধীরে ধীরে বললে—তবে কি বলতে চাও, তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম?

এদিক-ওদিক চেয়ে বিজয়া বললে—বাবা আসছেন বোধ হয়।

তা আসুন।—উঠে দাঁড়িয়ে জহর বললে—কথাটার উত্তর দিয়ে যাও। এবার থেকে তোমাদের শ্রদ্ধা করে' আমায় চলতে হবে?

বিজয়া চলে যাচ্ছিল—থমকে দাঁড়িয়ে বললে—না যদি চলেন আমাদের কোনো ক্ষতি নেই বরং ক্ষতি আপনারই। এই মন নিয়ে কারো বাড়ীতে ঢুকতে গেলে তারা তাড়িয়েও দিতে পারে!

পরদাটা সরিয়ে সে ভেতরে চলে গেল!

জহর সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলো। চোখ দিয়ে তখন যেন তার আগুন ছুটে বেরুচ্ছে! মনে হলো, ঘরের জিনিষপত্রগুলো পর্য্যন্ত যেন তার অপমানিত আহত মুখখানার দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে হাসচে!

কোন্ এক সময় মাষ্টার মশায়ের পায়ের শব্দ শুনে ঘর ছেড়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে হন্ হন্ করে চল্‌তে লাগলো।

পুরুষের রূপের বর্ণনা নাকি কাণে বাজে! কিন্তু যে রূপটা মেয়েদের চোখে ভালো লাগে জহরের ছিল সেই

রূপ। বর্ণের একটা তীব্রতা, প্রাণের অধীর আবেগ, প্রাচুর্য্যময় উদ্দীপ্ত যৌবন! মেয়েরা হঠাৎ কোনো পুরুষকে দেখে যেমন বলে—রাজপুত্তুর! অর্থাৎ সে যুদ্ধ করে' প্রাণ হারাতেও জানে এবং প্রেমের জন্য রাক্ষসকুলের ভেতর থেকে নারী-রত্নকে উদ্ধার করতেও পারে! নারীর মধ্যে নারী ছাড়া হয়তো আর কিছুই নেই কিন্তু পুরুষের মধ্যে যেন নর-নারীর অপূর্ব্ব সম্মিলন!

মোহিতের সঙ্গে আলাপ হওয়ার মধ্যে এই রূপটাই অনেকখানি দায়ী। মোহিত নিজে সুশ্রী কিন্তু সুন্দর নয়। সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের মমতা আছে, ঈর্ষাও আছে। এই মধুর ঈর্ষাটুকু থেকেই দুজনের আলাপ দাঁড়িয়ে ওঠে।

প্রথম আলাপের সূত্র একটি ছিল নিশ্চয়। কিন্তু সেটা যে কি, তা আর আজ এই বন্ধুত্বের দিনে মনে করা যায় না!

মোহিত বলে—আমাদের দেশের লোকগুলোর চেহারা যেন কিম্ভূতকিমাকার! নোংরামি যেন এদের পৈতৃক সম্পত্তি! হতভাগাদের কাণ ধরে' ফ্রান্সে নিয়ে যেতে হয়! দেখে আসুক একবার তাদের—

তার এমনি বেয়াড়া দেশপ্রীতি মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে

পড়ে। শুধু তাই নয়, সে যে জমিদার, এ-কথাটাও বন্ধু-বান্ধবরা ভুলতে পারে না।

যাতায়াতও তার কাছে ঘন-ঘন বৈ কি।

...ফটকে ঢুকতেই দুধারে ফুলের বাগান। বাগানের সীমানায় পাথরের বাঁধ,—নীচে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে মেয়েরা প্রাতঃস্নান করে আসে। বাড়ীখানির স্বাস্থ্য একেবারে মনোরম। মাঝখানে সীঁথির সিঁদুরের মত লাল সুর্‌কির পায়ে-চলা পথটি বা'র-বাড়ীর বড় দালান অবধি উঠে গেছে। মার্ব্বেল পাথরের দালান,—আরসির মত দিন-রাত অমনি ঝক্‌ঝক্ করে। খালি পায়ে হাঁট্‌লে সুড়সুড়ি লাগে। দেয়ালের গায়ে নূতন আর পুরাতন অনেক রকমের ছবি। প্রাচ্য আর প্রতীচ্য যেন বন্দী হয়ে ফাঁসি-কাঠে ঝুল্‌ছে!

ভীরু পায়ে অতি সন্তর্পণে জহর বাইরের ঘরে এসে ঢোকে। ভীরু বৈ কি! ধনীর গৃহে প্রবেশ করতে দরিদ্রের সেই চিরকালের সঙ্কোচ!

অপরাহ্ণ বেলা। মোহিত তখন বাইরের ঘরে বসে' লেখাপড়া করছিল। কিন্তু লেখাপড়া তার অনেকদিন

শেষ হয়ে গেছে। আজকাল ইংরেজি মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন পড়ে আর বিলাতে মালের অর্ডার পাঠায়। বিলাতের যা কিছু সমস্তই তার ভালো লাগে।

মুখ তুলে মোহিত বললে—কি ভাগ্যি, আজ এত সকাল-সকাল যে?

জহর হেসে বললে—ওই ত আমার দোষ, আড্ডা কোথাও পেলে সময়-অসময়ের আর কোনো হিসেবই থাকে না। তারপর? ভাবছিলে কি এতক্ষণ?

ক্যামেরাটার কথাই ভাবছিলাম। কিনে ফেলা যাক্, কি বলো?

জহর বললে—ব্যস্, আর কিছু বলতে হবে না। ভাববার সময় মোটেই নেই। ভাববার আগেই কাজে নেমে যাবে। ভেবে ভেবেই আমাদের সবটা নষ্ট হয়ে গেল, কাজ আর কিছু হলো না।

তার বলবার ভঙ্গী দেখে মোহিত হেসে ফেললে।

জহর বললে—সত্যিই তাই! যেদিকে ভাবনা, যেদিকে বিবেচনা, দেখবে, সেদিকে কখনও কাজ হয় না। ভাবনা-চিন্তা করতে-করতেই দিন কেটে যায়। হ্যাঁ আর না—কিছুতে ঠিক হয় না। ঐ জন্যেই তো

সেদিক থেকে আমি একেবারে মুখ ফিরিয়ে থাকি! কতকগুলো খেয়াল দিয়ে জীবনটাকে শুধু ভরিয়ে রাখবো —নাহলে এর ফাঁক পোরাবো কি দিয়ে?

কথায় কথা বেড়ে যায়। মোহিত তখন গল্প করতে বসে। কিন্তু তার কথার মধ্যে গল্প ছাড়া আর সবই আছে। স্বদেশের চেয়ে বিদেশের প্রতি টানই যেন তার একটু বেশি। এদিকে তার মাথা ভারি পরিষ্কার। ফ্রান্সের মেয়েদের পোষাক-ফ্যাসান কতদূর এগিয়েছে, আমেরিকার সিনেমা কোম্পানির দৈনিক লাভ-লোকসান, বিলাতের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, জার্ম্মানী গোপনে গোপনে আর যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করছে কিনা, সমস্তই তার নখদর্পণে!

এক সময় মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে চেয়ে মোহিত বললে—এ কি, এরই মধ্যে বেড়ানো শেষ হয়ে গেল! —এটি আমার ছোট বোন—মাধবী!

ছোট একটি নমস্কার করে মাধবী বললে—দাদা, তোমায় ধন্যবাদ! আমাদের পরিচয় হবার জন্যে কিন্তু তোমার অপেক্ষা রাখিনি।

পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে মোহিত বললে— তার মানে? আগে থেকেই বুঝি তোমাদের—

জহর অলক্ষ্যে একবার মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ, লোকের বাড়ী গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে চিরদিন আমার আগেই পরিচয় হয়ে যায়।

মাধবী একটু হাসলো।

কিন্তু সে হাসির অর্থ বোঝা চলে না। অর্থাৎ তাতে স্নিগ্ধতাও যেমন, সহজ ঔদাসীন্যও ঠিক ততখানি।

মোহিত বললে—ঠিক ত! আমিও তাই বলি। বিলেত হলে—

দাদা!

মাধবীর মুখের দিকে চেয়েই বাকি কথাটা মোহিত গিলে ফেললে। পরে বললে—মাধবীর স্বমুখে বিলেতের কোন কথা বলবার জো নেই!

জহর বললে—তাই নাকি? উনি তা হলে কাছে থাকলে আমিও যে তোমার বিলিতি রোগ থেকে বাঁচি!

এ ক্ষেত্রে যে-দুজনের হাসলে মানায়, তারাই মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

মোহিত আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বললে—তা তোমরা ভাই যাই বলো—

মাধবী বললে—বলিনে আমরা কিছুই, কিন্তু অতটা

তোমার ভালো নয়—বুঝলে দাদা? স্বদেশ বলেও একটা বাজে কথার চলন আমাদের মধ্যে আছে!

মোহিত বিজ্ঞের মত একটুখানি অবজ্ঞার হাসি হাসলো। এত ছোটখাটো কথা সে যেন মোটেই গ্রাহ্য করে না!

চা এবং জলখাবার এলো। মাধবী উঠে সেগুলো টিপয়ের ওপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললে—আপনাকে দেখলে ত খুব পরিশ্রমী মনে হয় না! তবে এত কাজ থাকতে ডাকঘরের চাকরি নিতে গেলেন কেন?

জহর হেসে বললে—কি করি বলুন, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য। কোনোরকমে অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে ত!

তাই বলে এই ডাকঘরের কাজ?—বলে মাধবী নিঃশব্দে নিজের কাজ করতে লাগলো। মুখখানি যেন মৃদু বেদনায় এবং সহানুভূতিতে ঈষৎ ভারি হয়ে উঠলো।

জহর বললে—দরিদ্রের পেট চালানো যে কি ভয়ানক সমস্যা, কেমন করে' তাকে দিন গুজরাণ করতে হয়, এ বোধ হয় আপনারাও জানেন!—বলতে বলতে জহর যেন এ সমস্ত ছাড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কি একটা কথা ভাবতে লাগলো।

একটু পরেই রাগিণী খট্-খট্ করে জুতা পায়ে দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। বললে—গুড্ ইভ্নিং জহরবাবু, কখন এলেন ?

এই মাত্র। ভালো আছেন ?—জহর বললে।

মোহিত একবার সকলের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে উঠে গেল। রাগিণীর সঙ্গে কি জানি কেন তার বনিবনা একটু কম। কিন্তু জহরের মুখচোখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। চিঠির কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ার একটা ভয়ানক ভয় তার মনটাকে দোলা দিচ্ছিল।

রাগিণী বললে--তোমার আর কোনো কাজ নেই, মাধবী ?

মাধবী বললে—এখন আর কোন কাজ থাকতে পারে না।

বেশ, তাহলে ঘরে থাকবার কি দরকার ? একটু বেড়িয়ে এলেই ত পারো

তাই যাওয়া হচ্ছিল ! আচ্ছা, নমস্কার !—বলে জহরের দিকে একবার চেয়ে মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

রাগিণী আস্তে আস্তে বললে—ছোট বোনটি আমার একটু ছেলেমানুষ,—একটু সেন্টিমেণ্টাল্ !

জহর বললে—আপনিও কি নন ?

আমি ? মাই গুড্‌নেস্! আমার মধ্যে কি কোনো ন্যাকামির গন্ধ পেয়েছেন ? আমি অত্যন্ত রিয়াল্ টাইপের মেয়ে ! ধোঁয়ার ছোঁয়াচ আমার কাছে এতটুকুও পাবেন না !

জহর মনে মনে একেবারে অবাক হয়ে গেল ! এরকম পুরুষোচিত কথাবার্ত্তা জীবনে সে কচিৎ কোনো মেয়ের মুখ থেকে শুনেছে ! তার যেন একটু ভয়ও হলো !

খানিকক্ষণ পরে জহর ওঠবার চেষ্টা করলো। রাগিণী বললে—বেশ ত, যাবেন, তার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন ? চা খেয়েছেন—এবার একটু গান শুনে যান্। ডাকঘরের চাকরি, গান শোনবার আর সময় কোথা পান্, বলুন ?

মেয়েটির মুখ থেকে সকল সময়েই যেন একটি করুণা-মিশ্রিত প্রচণ্ড মুরুব্বিয়ানার ভাব বেরিয়ে আসে ! একটা যেন তাচ্ছিল্যের সুর ! কিন্তু তার অনিন্দ্য রূপের দিকে চেয়ে তাকে এড়ানো যায় না—চুপ করেই বসে থাকতে হয়। আভিজাত্য মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে, কথায়-বার্ত্তায় একেবারে উছ্‌লে পড়ছে ! জহর নিঃশব্দে তার ভঙ্গীর দিকে চেয়ে বসে রইলো।

হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে রাগিণী গান গাইতে লাগলো। গান গায় সে চমৎকার! গাওয়া হলে সে উঠে এলো। বললে—এগুলো আমি সত্যিই ভালোবাসি—বুঝলেন জহরবাবু। মেয়েদের মেয়ে হয়ে থাকলে আর কিছুতেই চলবে না। সব বিষয়ে তাদের পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতেই হবে। দাদার সঙ্গে এই নিয়েই ত আমার কথা কাটাকাটি হয়! এবার কল্‌কাতায় কিছু দিন থেকে নাচ শিখে আসবো, ভাবচি। আমি একটু একটু ঘোড়ায় চড়তেও জানি, তা শুনেছেন ত?

তাই নাকি?—জহর বললে। না, এ-কথা আমি শুনিনি।

হ্যাঁ, সত্যি! বলে রাগিণী উঠে দাঁড়ালো। বললে—এই জন্যেই আমি আজ পর্য্যন্ত বিয়ে করিনি! মনে মনে আমার অনেক মতলব আছে, বুঝলেন?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। জহরও উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা, আজকের মত আসি।

আসুন, নমস্কার।—বলে চুপ। গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে রাগিণী বললে—কিছু মনে করবেন না, একটি কথা বলি। আমার বন্ধু নলিনীবাবুর চিঠিপত্র যদি আমার নামে

আসে ত ডাকঘরে আপনি সেগুলো একটু যত্ন করে রাখবেন। আপনি প্রায় রোজই ত এখানে আসেন, চিঠিগুলি যদি আপনি সঙ্গে করে আনেন, তা হলে ভারি উপকৃত হবো।

আচ্ছা, তার জন্যে আর কি!—হাসতে হাসতে জহর হঠাৎ বললে—না হয় দিন কতক আপনার পিয়নের কাজই করা গেল! তবে আমি একটু স্থবিধাবাদী লোক,—এ কথা আপনাকে বলে গেলাম!

রাগিণী হাসতে হাসতে জহরের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে করমর্দ্দন করে গুড্ নাইট্ বলে চলে গেল!

জহর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ালো, মুহূর্ত্তের জন্য কি যেন ভাবলো, তারপর হঠাৎ হেসে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

ঘরে ঘরে তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। বাগানের পাশে এসে পথে নামতেই দেখে, মাধবী সেখানে একা একটি ফুলের চারার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জহর বললে —এখানে যে?

মাধবীর মুখ একটু লাল হয়ে উঠলো। সেদিকে কেউ

ছিল না। সে বললে—বেড়াতে যেতাম কিন্তু দিদির হুকুমে আমি কোথাও যাইনে।

কেন বলুন ত? দিদির সঙ্গে বুঝি ঝগড়া আপনার?

মাধবী বললে—না, সে কিছু নয়! উনি সব সময়ে আমাকে অত্যন্ত দাবিয়ে রাখেন, তাইতে ভারি খারাপ লাগে। ভেতরে ওঁর কি, তা জানিনে কিন্তু বাইরে এত কড়াকড়ি আমার ভালো লাগে না।

জহর বললে—এখানে দাঁড়িয়ে ওঁর নিন্দে করে আমাদের আর কি লাভ হবে, বলুন? আচ্ছা—

চলে যাবার উপক্রম করতেও মাধবী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলো—আপনার আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছেন?

আমার আত্মীয়?—অকস্মাৎ জহর যেন স্তব্ধ হয়ে গেল! এ প্রশ্ন যে তার প্রতি কত বড় আঘাত, তা শুধু সে-ই জানে। বললে—এ কথা আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেন নি। আমার কেউ নেই, জানেন! একলা বহুকাল থেকে আমি এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনেক জায়গায় গেছি, অনেক পেয়েছি, অনেক হারিয়েছি—সে সব

কথা আপনাকে গল্প করে বলতে পারি। কিন্তু আমার কে আছে, দয়া করে ও-কথাটি আর জিজ্ঞেস করবেন না!

তার কম্পিত কণ্ঠের দিকে একবার চেয়ে মাধবী চুপ করে রইলো। পরে মুখ তুলে বললে—আপনি এমন আঘাত পাবেন জানলে আমি এ-কথা জিজ্ঞাসা করতাম না। আমায় ক্ষমা করুন। আমি না জেনে যদি—

জহর একটু ম্লান হাসি হাসলো। বললে—না, না, ও কিছু নয়। তারপর একটু থেমে আবার বললে—কেউ নেই, তাই পথের লোককে আপনার করে নেবার চেষ্টা করি। পথ ছাড়া আমার আর কোনো সম্বলই নেই!

আসন্ন রাত্রির অন্ধকারের দিকে চেয়ে মাধবী একবার কি বলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কেন জানি না, তার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে এলো। মৃদু কণ্ঠে সে বললে—আপনার কথা আজ সমস্ত দিন ভাবছিলাম!

আমার কথা?—জহর একটু হেসে ছোট একটি নমস্কার করে' তাড়াতাড়ি অন্ধকার পথে নেমে চলে' গেল।

সমস্ত রাস্তাই ভাবতে ভাবতে চললো এই মাধবীর কথা।

কি যেন এক অপরিচিত অনুভূতির আবেগে বারবার তার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো! নারী-হৃদয়ের কোনো অন্তর্নিহিত বস্তুতে আজ পর্য্যন্ত সে বিশ্বাস করে নি! মাধবীর এই অপরিসীম সহানুভূতি তাকে যেন বারবার পীড়িত করতে লাগলো! সমস্ত জীবন ধরে' সে যে-বস্তুটিকে এড়িয়ে এসেছে, নারীর মমতাকে সে কোনোদিন ভালো চোখে দেখতে পারেনি—নারী শুধু মূর্ত্তিমতী লালসা—সেই আত্ম-প্রত্যয়ের মূল যেন আজ অকস্মাৎ শিথিল হয়ে এলো! ভগবানকে সে মানে না, যদি মানতো, তাহলে আজ বোধ করি করজোড়েই সে আর্দ্র চক্ষে প্রার্থনা জানাতো—হে ভগবান, আমার বিশ্বাসকে এমন করে' ভেঙ্গে দিয়ে আমার জীবনকে দুর্ব্বহ করে' তুলো না!

মন যেন আজ তার কোনো উদার বেদনার সন্ধান পেয়েছে!

ওপরে আকাশ ততক্ষণ ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। ঝম্‌ঝম্ করে' যখন বৃষ্টি এলো, জহর তখনও পথ চলছে। বুকের ওপর আজ যেন সমস্ত বর্ষাকে সে আলিঙ্গন করে নিতে পারে! মাধবীর অব্যক্ত কণ্ঠের মত সমস্ত আকাশ যেন আজ মেঘে মেঘে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে! দিগন্তজোড়া

বর্ষা যেন মাধবীর দুটি সজল চোখের মত! বাতাসে যেন মাধবীর দীর্ঘনিশ্বাস।

পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি সে আসছিল, পিছন থেকে হঠাৎ কার স্পর্শ পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। মুখ ফিরিয়ে বললে—এই যে রামচন্দর? অনেকদিন বাদে—তারপর?

জলে-ভেজা খানিকটা আলো এসে সেখানে পড়েছিল, সেই আলোতে এবং সেই দারুণ বৃষ্টিতেই রামচন্দর জহরের পায়ের কাছে বসে পড়ে বললে—আপনার পায়ে আমি কি অপরাধ ক'রেছি বলতে পারেন দাদা? বলতে বলতেই সে ঝরঝর করে' কেঁদে ফেললো।

হাত ধরে রামচন্দরকে তুলে জহর বললে—অপরাধ তোমার কিছু নেই ভাই। চলো এখান থেকে,—ভারি বৃষ্টি পড়ছে।

ছোট ছেলেটির মত রামচন্দর বললে—চলুন তবে আমার ঘরে, পায়ের ধুলো আপনাকে দিতেই হবে।

চলতে চলতে জহর বললে—মনে হচ্ছে, তুমিই আমার সত্যিকারের বন্ধু রামচন্দর! জীবনে আমার শুধু বন্ধু পাবার সৌভাগ্যই হয়নি। ছি, ছেলেমানুষের মত কেঁদো না—চলো।

বাসায় গিয়ে বসতেই রামচন্দর একটি পুঁটলি বার করে এনে জহরের পায়ের কাছে রেখে বললে—এই নিন্, —আপনার কাছে অপমান তিরস্কারের ভার বরং সইতে পারি কিন্তু আপনার এ দানের ভার আমি আর বইতে পাচ্ছি না, দাদা! এর থেকে আমাকে মুক্তি দিতে হবে! এতে আপনার সোনার বোতাম, ঘড়ি, আংটি, শাল, সেই গরদের জামা—সমস্তই আছে। এ আপনাকে নিতেই হবে।

প্রথমে কোনো কথাই জহরের মুখে এলো না। পরে সে বললে—যাদের একবার ত্যাগ করেছি, তাদের ত আর গ্রহণ করতে পারিনে রামচন্দর!

রামচন্দর অধীর আবেগে তখনও চোখের জল ফেলছিল। সে বললে—সাধনা যদি আমার থাকে, তাহলে আপনাকে একদিন পাবোই। আমি শুধু আপনাকেই চেয়েছিলাম, তুচ্ছ জিনিষে লোভ আমার কোনোদিন ছিল না, দাদা। অন্যায় আমি করেছি, আপনাকে বেশ্যা-বাড়ী নিয়ে গেছলাম, কিন্তু জানতাম, মানুষ বলে' একদিন আমাকে ক্ষমা করবেন! একদিন আপনার মনে হবে, যত দুঃখ জীবনে আপনি পেয়েচেন, তার চেয়ে বড় দুঃখ এই রামচন্দরের জীবনে আছে! সে শুধু পরের কাছে নিজের

দুঃখের কাহিনী জানাতে পারে না, এই তার ত্রুটি! নাহলে এ পৃথিবীতে আমার চেয়ে দরিদ্র আর কে?

তা বটে!—জহর চুপ করে' রইলো। জীবনে যাদের আলো নেই, বাইরের উত্তাপে হৃদয় যাদের শুকিয়ে গেছে, সমস্ত ইহ-জীবনের বাসনা যাদের ঝ'রে পড়েছে—এ জগতে তাদের স্থান কোথায়? কৈ, এত বড় একটা কথা ত তার কোনোদিন বুকের মধ্যে দোলা দিয়ে যায়নি! রামচন্দর যেন পৃথিবীর সমস্ত বেদনার প্রতিনিধি হয়ে তাকে আজ অকস্মাৎ এই কথাটারই আভাস জানিয়ে দিল!

জহর বললে—আমি চিরদিন সরলতার কাঙাল। আমাদের সকলের জীবন পবিত্র সুন্দর হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনাই আমি চিরদিন করে আসছি। তোমাকে দেখে বুঝলাম যে পৃথিবী আজো কেন রসাতলে যায়নি! তোমার চেয়ে বয়সে আমি ছোট কি বড়, তা জানিনে রামচন্দর, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়! এত বড় যে আমি তার নাগাল পাইনে! চললাম বন্ধু,—পুঁটুলিটাও নিয়ে যাচ্ছি।—তোমাকে দান করবো এতখানি অহঙ্কার আমার নেই! বলে পুঁটুলিটা নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো

কাছে এসে রামচন্দর বললে—দাদা, আবার কবে—

দেখা ?—হেসে জহর বললে—দেখা যদি আর না হয়, তা হলে জেনো, তুমিই আমার মধ্যে সব-চেয়ে বড় আসন নিয়ে রয়ে গেলে রামচন্দর !

বল্‌তে বল্‌তে সে জল-কাদার মাঝখানে নেমে আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল !

সেদিনটাও ছিল শনিবার। অফিস-ঘরের মধ্যে বসে' বসে' জহরের আর-কিছুই ভালো লাগছিল না। মাষ্টার মশাই মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে সম্প্রতি হুগলীতে গেছেন। কদিন ছুটির পর ছেলেরা শহরে চলে গেছে। জগন্নাথ আর সুরেশ নিজেদের ডিউটি বজায় রেখে বাসায় গিয়ে ঘুমোচ্ছে। বুড়ো পিয়ন চিঠি বিলি করতে সেই সকালে বেরিয়েছে—এখনও তার ফেরবার সময় হয়নি। শম্ভু এই মাত্র কাজ সেরে চলে' গেছে।

বসে বসে জহরের তন্দ্রা আসছিল। দরজার কাছে খস্‌খস্ শব্দ হতেই চোখ চেয়ে দেখলো, কাগজ-কলম নিয়ে বিজয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। জহর একটু হাসলো। বললে—কি ? রাগ পড়লো ?

বিজয়া সে কথার জবাব না দিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বললে —আমার মাসীমার ঠিকানাটা লিখে দেবেন এই কাগজে ? কাশীর ঠিকানা ! সেই যেমন সেদিনে লিখে দিয়েছিলেন ?

কাগজটা এনে সে টেবিলের ওপর রাখলো। পরে বললে—কাজে আপনি এত ফাঁকি দেন কেন ?

ঠিকানাটা লিখতে লিখতে জহর বললে—এই বুঝি তোমার গাম্ভীর্য্য ?

তারপর ঠিকানা লেখা হয়ে গেলে সে আবার বললে— আর আমার এখানে ভালো লাগচে না বিজয়া, এবার আমি চলে' যেতে চাই।

কোথায় যাবেন ?

যেখানে হোক্ ! শুধু এই কাজের দাসত্ব থেকে ছাড়া পেতে চাই।

বিজয়া চুপ করে' রইলো। জহর বললে—সন্নিসী হয়ে যাবো বলছিনে, কিন্তু আর আমি পাচ্ছিনে।

আজ হঠাৎ সে চেয়ে দেখলো, বিজয়ার ছুটি অসহায় চোখ যেন ছল্‌ছল্ করে এলো ! কি যেন সে বলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু মুখে ফুটলো না ! শুধু বললে—তা বলে বাঁচতে হবে ত !

জহর বললে—একে কি বাঁচা বলে বিজয়া ? প্রতিদিন তিলতিল করে মরার নাম কি বাঁচা ?

বিজয়া হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিলে—তার চোখে জল এসেছিল !

জহরের কি মনে হলো—নিজেকে সে সম্বরণ করতে পারলো না। উঠে বিজয়ার একখানা হাত ধরে তাকে একেবারে কাছে টেনে নিয়ে এলো। বিজয়া মাথা নীচু করলো—অসঙ্কোচে বিজয়ার চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখখানি তুলে আবেগ-জড়িত কণ্ঠে জহর বললে—এর কোনো মানে হয় বিজয়া—তুজনে নদীর এ-পারে ও-পারে দাঁড়িয়ে এ খেলা ?···খেলাই এ ! আমি চলে যাবো শুনে তোমার চোখে জল আসা—এ মিথ্যা ! তোমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া—এও তেমনি মিথ্যা। আমি জানি, তোমাকে আমি যেমন পেয়েছি, তুমিও আমাকে তেমনি পেয়েছো—এর বেশী পেতে চাওয়া—না—তাহলে এ পাওয়ার কোনো ছাপ থাকবে না। এই বেশ ! চোখের জল ফেলো না।···চেয়ে ছাখো আমার পানে।

কোনোমতে বিজয়া জলভরা তুটি চোখ তুলে জহরের মুখে সে চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। বিজয়ার ঠোঁট

ছুটি কাঁপছে···বাতাসের দোলায় কচি কিশলয় যেমন কাঁপে!

জহরের বড় ভালো লাগলো।···মমতায় বিজয়ার চোখের জল মুছিয়ে তাকে বুকের উপর টেনে তার তপ্ত ললাটে চুম্বন করে বললে—এই বেশ! তুমি বুঝে দেখো ঠাণ্ডা হয়ে! আমরা পথের বন্ধু···পথ চলতে ক্ষণেকের জন্য দেখা। পথে আমরা দুজনেই পরস্পরকে পেয়ে বড় সুখে দিন কাটিয়েছি—দুজনে দুজনকে ভালোও বেসেছি। অনন্তকালের মধ্যে এই মুহূর্ত্তটিই হয়তো সত্যি! এর মধ্যে সমাজ নেই—কোনো সংস্কারও নেই!

বিজয়া নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করেছিল—অনেকক্ষণ পরে আস্তে-আস্তে জহরের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে—আর একটি দিনও থাকবে না?

জহর কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাইরে বুড়ো পিয়নের পায়ের শব্দ পেয়ে বিজয়া তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল।

কাজ-কর্ম্ম সেদিনকার মত শেষ হয়ে গিয়েছিল। বুড়োকে কাজ বুঝিয়ে দিতে খানিকক্ষণ সময় গেল। তারপর একখানি পরিষ্কার কাগজে পদত্যাগ-পত্র লিখে

নীচে নিজের নাম স্বাক্ষর করে জহর সেখানা মাষ্টার-মশায়ের টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালো! কাকেও কোনো কথা বললে না—কেউ জানলোও না! সে শুধু অন্দরের দিকে একবার চেয়ে মৃদু হেসে নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। মুক্তির আনন্দে, কি, কিসের আনন্দে, কে জানে!—তার ভেতর থেকে কে যেন হেসে হেসে উঠছিল! আজ তার আর কোনো আকর্ষণ নেই!

অনেকক্ষণ ধরে' এখানে-সেখানে সে ঘোরাঘুরি করলো। অবেলার শুক্‌নো হাওয়া রাস্তায় রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে মাঝে মাঝে বয়ে যাচ্ছিল। কোথায় যাবে, এমন কোনো ঠিকানাই তার ছিল না। বিজয়ার ওপর অপরিসীম করুণায় তার অন্তর ভরে' উঠেছিল। একটু আগে যে ছেলেখেলাটি হয়ে গেল, এর গোড়ায় মেরুদণ্ডহীন সমাজের একটি প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা লুকিয়ে রয়েছে!

আদালতের নীচে এসে গঙ্গার ঘাটে জহর খানিকক্ষণ বসে রইলো। কিন্তু ভালো লাগলো না। অতীত দিনে তার জীবনে যেমন কোনো বাঁধা পথের ঠিক ছিল না, আজও ঠিক তেমনি নেই, এবং কালও থাকবে না!

বিকাল উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আসন্ন সন্ধ্যার আলোকের

দিকে চাইলে মাধবীকে মনে পড়ে। সন্ধ্যার মত মাধবী তার মনের সমস্ত আকাশে যেন একটি নিবিড় কারুণ্য নিয়ে দেখা দিয়েছে! মাধবীর দিকে ভালো করে চেয়ে থাকলে উৎকৃষ্টতর জীবনের প্রতি একটা তৃষ্ণার্ত্ত ব্যাকুলতা তার ভেতর থেকে যেন করুণ কণ্ঠে কেঁদে ওঠে! নিজের সমস্ত দৈন্যের প্রতি আর প্রতিদিনের মিথ্যাচারের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা আসে!

চলতে চলতে সে মোহিতদের বাড়ীর কাছে এসে হাজির হলো। এসে একটুখানি থমকে দাঁড়ালো। গত কয়েকদিন ধরে' রাগিণীর ব্যবহার স্মরণ করে' তার যেন আর পা উঠছিল না! নারীর যে দুর্ব্বলতা সবার চক্ষে হেয়, রাগিণী সেই বস্তুটিকে আজ পর্য্যন্ত জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে প্রশ্রয় দিয়েছে! তার লেখাপড়া, ধ্যান-ধারণা, আভিজাত্য—সমস্তটাই সে-দুর্ব্বলতার কাছে যেন ঝরে' পড়ে যায়!

ফটকে ঢুকতেই মাধবীর সঙ্গে দেখা। একটি বালক-চাকর তার নির্দ্দেশ-অনুযায়ী ফুলের চারার মাথা ছেঁটে

দিচ্ছিল। জহরকে দেখে একটু হেসে মাধবী বললে—নমস্কার করাটা পুরোনো হয়ে গেছে! আসুন। এই দেখুন, আমার কাজের কামাই নেই,—এগুলো আমি না দেখলে কে আর দেখে, বলুন? দিদি এ-সব গ্রাহ্যই করে না! এ রকম কাজে দিদির কোনো আনন্দ নেই।

জহর বললে—তাঁর একটু রাজসিক ধাত।

তাই বটে! ও যেন কেবলই যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে আছে।—একটু হেসে মাধবী আবার বললে—আমরা সবাই স্বার্থপর, কিন্তু দিদি নিজের স্বার্থের জন্যে এমন কাজ নেই, যা কর্‌তে পারে না! দিদিকে দেখলে আমার ভয় করে—বুঝলেন?

কেন বলুন ত?

মাধবী আর একবার হাসবার চেষ্টা করে' বললে—এসব বলে যে দিদির নিন্দে করছি, তা নয়। এ সবই সত্য কথা। কিন্তু—না, সে আপনার শুনে কাজ নেই! মেয়েদের কথা নাই বা শুনলেন!

জহর বললে—মেয়েদের কথা শুনতে ক্ষতি নেই, কিন্তু লজ্জার কথা হয় যদি—থাক্—বলবেন না।

মাধবীর মুখখানা দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠলো।

সে বললে—আজ আপনাকে এমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে, বলুন ত?

জহর বললে—হয়নি কিছুই তবে আজ সব শেষ করে দিলাম!

সে কি?

কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে এবার যাবার পথে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের কাছে যদি বিদায় নিই, তাহলে কিছু মনে করবেন না।

বিদায়!—হঠাৎ মাধবী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল! পরে বললে—তাই যদি নেন ত বাধা দেবে কে, বলুন? মেয়েমানুষ ত নন যে লোকে ঘরে পুরে বেঁধে রাখবে!

জহর সেখানে আর দাঁড়ালো না। বাড়ীর মধ্যে ততক্ষণে সকল ঘরেই আলো জ্বলে উঠেছে। বোধ করি, মোহিতের সঙ্গে দেখা করে' আসবার জন্যেই সে আস্তে আস্তে ভেতরে গেল।

কিন্তু বাইরের ঘরে মোহিত ছিল না—রাগিণী বসে একটা সেতারের তার বাঁধছিল। জহরকে দেখে রাগিণী হেসে বললে—নটি বয়! আসুন! আজ ভালো করে' আপনাকে

বাজনা শোনাবো। কাল আমার নিন্দে করে' গেছেন মনে হচ্ছে।

বয়সে ছোট হলে কি হয়, ব্যক্তিত্বে রাগিণী তার চেয়ে অনেক বড়। হাসিতে, তামাসায়, কথাবার্ত্তায়, এবং সর্ব্বশেষে মুরুব্বিয়ানায় জহর সত্যিই তার কাছে অনেক ছোট!

না, না, এইখানেই বসুন। সেইদিনই বলেছি, আপনাকে আমি একটু বেশী গ্রাহ্য করি! মাধবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে? আজকাল মাধবীর গতিবিধি আর ভাবভঙ্গী আমার ভালো লাগচে না।

সেতার বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। সেটা হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে রাগিণী বললে—আসুন, আমার নিজের ড্রয়িং-রুমে যাই—অর্গানটা ওপরে নিয়ে গেছি। আসুন।

জহরকে অগত্যা উঠতে হলো। রাগিণী আগে আগে হেলে দুলে পথ দেখিয়ে ওপরে চললো।

নিজের ঘরে ঢুকে ইলেকট্রিক আলোটা জ্বেলে দিয়ে সে বললে—বসুন ওই সোফাটার ওপর। আচ্ছা, আমার ঘর যে রকম ভাবে সাজানো, আপনার পছন্দ হয়?

আমার পছন্দে কি এসে যায়?

খিল্‌খিল্ করে হেসে রাগিণী বললে—ও কথা বলে' আমাকে দমাতে পারবেন না। আপনার পছন্দে সত্যিই আমার অনেকখানি এসে যায়! নাহলে আমার ঘরে আপনাকে আনতাম না,—নীচের ঘরে গান শুনিয়েই আপনাকে বিদায় দিতাম।

জহরের কেমন যেন ভাল লাগছিল না! সে বললে—তাতেই বা কি ক্ষতি হতো?

কিছুই না! রাগিণী বললে—তবু আপনার মুখ থেকে আমি নিজের একটা প্রশংসা নিশ্চয়ই চাই—এটা জেনে রাখুন।

ধ'রে-বেঁধে প্রশংসা আদায় করবেন?

রাগিণী আবার হাসলো। বললে—আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল মেয়ে, দরকার হলে তাতেও আমি পিছপাও হবো না। আচ্ছা, এবার গান শুনুন।

অর্গান বাজিয়ে ক-মিনিট ধরে' সে একটা গান করলো। পরে বললে—চা খাবেন?

ধন্যবাদ। না।—কিন্তু আজ আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে—

মনে আমি কিছুই করবো না,—তা বলে এত

তাড়াতাড়িও আপনার যাওয়া হতে পারে না। গান আপনাকে আজ ভালো করে আমি শোনাবোই।

আবার সে গান ধরলো। গান শেষ হলে ছবির কথা উঠলো। সে আলোচনা শেষ হতেই জহর উঠে দাঁড়ালো। রাগিণী তাড়াতাড়ি সরে' এসে তার হাত ধরে তাকে আবার বসিয়ে দিয়ে বললে—মেয়েদের কথা না রাখা কি-রকম ভদ্রতা?

জহর আবার বসলো,—তারপর নভেল-নাটকের কথা উঠলো। তারপর বায়স্কোপের কথা। রাগিণী ঘরময় ঘুরে ঘুরে এদিকে ওদিকে নজর রেখে যা'তা বলে যেতে লাগলো। সকল কথার আড়ালে সে কি বলতে চায়, জহরের চেয়ে সে কি আর কেউ বেশী জানে?

জহর ক্রমে অধীর হয়ে উঠলো। এই চঞ্চলা বাক্‌পটু রূপসী মেয়েটির দিকে ক্ষণেকের জন্য তাকিয়ে সে দেখলো—এর উজ্জ্বল মুখে-চোখে, স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে, কণ্ঠে, সর্ব্বাঙ্গের আভরণে যেন একটি জ্যোতিষ্মান প্রবল আলোকের লহর উঠেছে! নারীর চিরদিনের লাবণ্যকে সে যেন ভাবে-ভঙ্গীতে সমস্ত ঘরময় বিকীর্ণ, বিচ্ছুরিত করে দিচ্ছে! সে যেন একটি সর্ব্বনাশিনী অগ্নিশিখা!

জহর বললে—না, সত্যি, এবার আমি যাই।

কাছে এসে রাগিণী বললে—আপনি জানেন, আপনাকে আমার ভালো লাগে। তার জন্যে কি এমনি ভাবে আপনার স্থবিধে নেওয়া উচিত?

জহর বললে—আমি ঠিক সে-কথা ভাবচিনে। এক্ষুণি যদি আমি আপনাকে একটা খবর দিই, তাহলে বোধ হয় আমাকে আর আপনার ভালো লাগবে না।

রাগিণী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—কি, বলুন?

জহর বললে—আপনার বন্ধু নলিনীরঞ্জনবাবু বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করেছেন, তা জানেন?

অ্যাঁ? কি বললেন? তাঁর কথা আপনি কি করে জানলেন? কে আপনাকে এ-কথা বলেছে?

জহর বললে—তিনি নিজে আপনাকে চিঠি লিখে সে-কথা জানিয়েছেন। আর সেজন্য চিঠিতে তিনি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

রাগিণী একটু রেগে বললে—বাজে কথা! রহস্য করছেন আপনি! আটদিন অন্তর তাঁর চিঠি আমি পাই, সে-কথা আপনি জানেন। এমন চিঠি আমি তাঁর কাছে পাইনি। তাঁর শেষ যে-চিঠি পেয়েছি পরশু, সে-চিঠিও...

বাধা দিয়ে জহর বললে—এ-খবর আমি খুব ভালো করেই জানি। তাঁর শেষ যে চিঠি আপনি পেয়েছেন পরশু, সে তাঁর চিঠি নয়—তিনি লেখেননি সে-চিঠি!

রাগিণী যেন আকাশ থেকে পড়েছে, তেমনি তার স্তম্ভিত ভাব! তার মুখে কথা নেই—অনিমেষ নেত্রে সে চেয়ে আছে জহরের দিকে। মনের মধ্যে যেন আগ্নেয়গিরি জ্বলচে!

জহর বললে—তাহলে আসল কথা শুনুন। আজ প্রায় ছমাস তিনি আপনাকে কোনো চিঠি দেননি। চিঠি-লেখালেখি এ-ছমাস যা হয়েছে, সে আপনাতে আমাতে। আপনি তাঁকে যে-সব চিঠি লিখেছেন--সে-চিঠি আমি নিয়েছি, পড়েছি, আর সে-সব চিঠির জবাব দিয়েছি আমি —চিঠির নীচে নলিনীরঞ্জনের নাম সহি করে। কথাগুলো বলে জহর আবার উঠে দাঁড়ালো।

রাগিণী ছুটে এসে তার হাত ধরে বললে—আমার সব চিঠি তাহলে আপনি…

পড়েছি। সমস্ত চিঠি। চিঠিতে যে-সব অকথ্য ভাষা লিখেছেন, তার প্রত্যেকটি আমার মুখস্থ আছে।

সেখানে বঁটি কিংবা বিষ থাকলে রাগিণী বোধ হয়

আত্মহত্যা করে’ বসতো! খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থেকে সে বললে—আমি বুঝতে পেরেছিলাম নলিনীবাবু ছোটলোক,—আগেই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল! এই পর্য্যন্ত বলে ক্ষণেক চুপ করে থেকে আবার বললে—তার বদলে তাহলে আপনিই আমায় চিঠি লিখতেন?

অন্য মেয়ে হলে ঘর থেকে তখন বোধ হয় ছুটে পালিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিত,—কিন্তু রাগিণী তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো। বললে—নলিনীবাবুকে আমি সত্যিই বিয়ে করতাম, তাকে আমি স্বামীর মতনই দেখেছিলাম।

জহর পা বাড়াতেই এবার নিতান্ত অসহায়ের মত রাগিণী তার হাত দুটো চেপে ধরলো; এবং অনর্গল তার মুখের ওপর যে সকল কথা বলে যেতে লাগলো, সেগুলি জহর এতবার শুনেছে যে কোনো কথাই আর নতুন মনে হলো না! এমন-স্বভাবের মেয়েদের মতই কথা! রাগিণীর অমন রূপ, অমন মাধুর্য্য, তেজস্বিতা এ সব কথার আঘাতে যেন খোলসের মত খসে পড়লো! যৌবন-রূপ-লাবণ্যের খোলস খসে রাগিণীর যে মূর্ত্তি প্রকাশ হয়ে পড়লো—তেমন মূর্ত্তি সে রাত্রে রামচন্দরের সঙ্গে সেই অন্ধকার গলিপথে সার সার

দেখেছিল জহর। সেই এক আকৃতি এবং একই ভাষা! শুনতে শুনতে জহরের দম বন্ধ হয়ে এল।

জহর চলে যাবার চেষ্টা করলো—রাগিণী আবার বাধা দিল; বললে—তুমি আমার সব জেনেছ, আমার সব এখন তোমার হাতে।—বলতে বলতে সে ঝরঝর করে' কেঁদে ফেললো। বললে—আমাকে আর লজ্জা দিও না! আমি—

কঠিন কণ্ঠে জহর বললে—কি চাও তুমি?

কাঁপতে কাঁপতে রাগিণী বললে—কি চাই বুঝতে পারোনি? না, তোমাকে আমি যেতে দেবো না,—তোমাকে আমি চাই! এই বলে সে যে কাণ্ড করে বসলো, জহর আর সেখানে দাঁড়াতে পারলো না! জোর করে সে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে বলে গেল—ছি ছি, তোমার একটুখানি লজ্জা থাকলেও বা দয়া করতাম!—বলে সে বেরিয়ে চলে যাবার উপক্রম করতেই দেখে, সাম্‌নে মাধবী।

ঘরের ভেতর থেকে রাগিণী তখন বলেছে—তোমাকে যদি আমি পুলিশে না দিই ত আমার নাম—ইত্যাদি!

মাধবীর সঙ্গে মুখোমুখি হতেই সিঁড়ির কাছে দুজনে দাঁড়ালো। লজ্জায় জহরের মাথা একেবারে হেঁট। সে শুধু বললে—কোনো কথাই আমার মুখে আসছে না! আপনার সঙ্গে কি কথা বলি—বলুন ত?

মাধবীও অপমানে লজ্জায় কোনো কথা বলতে পারছিল না, অতিকষ্টে মৃদুকণ্ঠে শুধু বললে—আমার ঘর থেকে সবই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম···দিদির হয়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

জহরের চোখ দুটো হঠাৎ কেমন যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো! সে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছিল, মুখ তুলে একবার চাইতেই মাধবী বললে—একটি অনুরোধ, দিদিকে দেখে যেন মেয়েদের বিচার করবেন না।

দুজনেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

রাত একপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাগানের কাছে এসে দুজনে দাঁড়ালো। নীচেই গঙ্গা—তরঙ্গের মৃদু মর্ম্মর ধ্বনি কানে আসছে। বহুদূরে নদীর বুকে একখানা পান্সীর লাল আলো দেখা যাচ্ছে। ওদিকের মহলে আর একটি

মেয়ে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরেছে—"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

জহর আস্তে আস্তে বললে—আপনার কাছে দাঁড়ালে আমি সকল কথাই ভুলে যাই। এ কি, বলুন ত?

মাধবী সে-কথার উত্তর দিল না, শুধু বললে—বিদায় নিতে এলেন,—যাবেন কোথায়?

কোথায়, জানি না। যে পথে চলেছিলাম, সে ভুল পথ। আমার ধ্যান-ধারণা সমস্তই চুরমার হয়ে গেছে! এ-পথ থেকে আমি চলে যেতে চাই। আমার চিরজীবনের সাধনা ওলটপালট হয়ে গেছে! বুঝলেন? আজ যাবার সময় অনেক কথা মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে, অন্য দিকটা আমার এখনও দেখা হয়নি! জীবনের সকল দিকের খোঁজ আমরা কেউই রাখিনে। শুধু এই কথাই ভাবচি, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে যে-আদর্শ নিয়ে মানুষ বেঁচে এসেছে, তাকে তুচ্ছ করলে অনেক দুর্গতি ঘটে মানুষের কপালে। অভাব আমার কিছুরই ছিল না,—নিজে আমি জমিদার! অল্প-বয়সে জীবনের খোঁজে পথে নেমে এসেছিলাম। যে ক্ষ্যাপা মন নিয়ে এসেছি, কিছুতেই সে খুশী নয়। যে-বস্তুটি কোনোদিন পাওয়া যায় না, তার ওপরই টান আমার সব চেয়ে বেশী।

মাধবী বললে—আর একটি দিন যদি—

না, আর একদিনও নয়। বুঝলেন, আপনার কাছে আমি যা পেলাম, বাকী জীবনে সেইটুকুই পাথেয় হয়ে থাকুক। যাবার সময় আর কিছু আপনাকে বলতে পাচ্ছিনে। আচ্ছা, আসি।—বলে জহর এগিয়ে গেল।

মাধবী হেঁট হয়ে নমস্কার করলো। স্পষ্ট দেখা গেল, দু ফোঁটা জল তার চোখে টল্‌টল্ করছে।

খানিকদূর গিয়ে অন্ধকারে দুজনেই একবার ফিরে তাকালো, পরিপূর্ণ দুটি দৃষ্টি দুজনকে খানিকক্ষণ মুগ্ধ করে দিল—তারপর জহর তাড়াতাড়ি চলে গেল।

রাগিণীর আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলে সে তখন বাঁচে!

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চারা গাছ থেকে একটি গোলাপ ফুল তুলে নাকের কাছে ধরে হঠাৎ অধীর আবেগে মাধবী ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললো।

প্রমীলা আর বাসুদেবের দিন তেমনি করেই কাটে।

বাসুদেব তেমনি পরোপকার করে বেড়ায়, রাস্তা থেকে কাঁচ কিংবা কাঁটা তুলে পথের একপাশে সরিয়ে রাখে, পাখীকে খাবার দেয়, পশুকে পালন করে।

প্রমীলা আজও তেমনি কাজের ফাঁকে-ফাঁকে পথের পানে তাকায়। হাওয়ায় গাছের পাতা খস্-খস্ করে উঠলে ভাবে, কার পায়ের শব্দ হলো বুঝি! দূরের আকাশের দিকে চেয়ে মাঝে-মাঝে উত্তপ্ত নিশ্বাস চেপে রাখতে পারে না। রাতের বেলা কাকে চিঠি লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়ে —ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে। দেখে, জহরের সঙ্গে সে যেন বহুদূর পথ অতিক্রম করে চলেছে—নদ-নদী, পর্ব্বত-কান্তার, বন-উপবন পার হয়ে! মহাসাগরে এলো—সাগর-তরঙ্গের মধ্যে দুজনে সাঁতার কাটছে! জহরকে যেন আর দেখা যাচ্ছে না! প্রমীলা কেঁদে উঠলো, চীৎকার করতে লাগলো, নিজের গলা নিজেই টিপে ধরলো! দেখলো, জহর আবার উঠেছে! সমুদ্র পার হয়ে দুজনে এলো এক মরুভূমির প্রান্তে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে; মরণ-পথের যাত্রী দুটি শুধু বলছে—জল, জল! তাদের এ তৃষ্ণা যেন আর কোনদিন মিটবে না। তারা যেন বিধাতার পতিত সন্তান! প্রমীলা যেন নিজের বুক

চিরে রক্ত বার করে জহরকে পান করাতে লাগলো, জহর তার সেই রক্তাক্ত ওষ্ঠাধর সরিয়ে এনে চিরদিনের প্রিয়ার অধরে চুম্বন করতে চাইলো ! প্রমীলা মুখ বাড়িয়ে দিল !

নিবিড় চুম্বনের স্পর্শে প্রমীলার ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখে, বাসুদেব তার মুখের ওপর মুখ রেখেছে ! প্রমীলা ধড়মড় করে উঠে বসে।

বাসুদেব হাসে, বলে—স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিলে !

স্বপ্ন ! প্রমীলা চমকে ওঠে ! স্বপ্ন মনে পড়ে ! বাসুদেব তাহলে ? কি তার মনে হয়। প্রমীলা বলে—হ্যাঁ, ভয়ের স্বপ্ন ! চেঁচিয়েছিলাম ?

—হ্যাঁ ! স্পষ্ট নয়, মুখে কথা ফুটছিল না···একটা চাপা শব্দ শুধু···ভয়ের শব্দ !

—ও···

প্রমীলা চায় বাসুদেবের পানে···বাসুদেব চেয়ে আছে একাগ্র দৃষ্টিতে ! ও-দৃষ্টিতে কত মমতা ! কত···কত···

প্রমীলা আর পারে না ! জেগে···ঘুমিয়ে স্বপ্নে··· কিন্তু কেন ? কি সে চায় ? কে তা দেবে ? জহর ? প্রমীলা কি পাগল হবে ? না। আবার কি মনে হয়,